নূতনের সন্ধান

সম্পাদকের নিবেদন

বিগত ১৯২৭ সালের মধ্যভাগে মান্দালয় জেল হইতে মুক্তি পাইবার পর ঐ বৎসরের শেষ সময় হইতেই শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় পুনরায় জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন; এবং তাহার পর হইতে ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে পুনরায় কারাগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গলা ও বাহিরের বহু স্থানে বিবিধ প্রতিষ্ঠানে বহু বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সকল বক্তৃতার মধ্য হইতে ছাত্র ও যুব-আন্দোলন সম্পর্কীয় মাত্র কয়েকটী অভিভাষণ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আরও অনেক অনুরূপ বক্তৃতা প্রকাশ করা গেল না। পুস্তকের সব কয়টি অভিভাষণ বাঙ্গলায় প্রদান করা হয় নাই—যে কয়টী ইংরাজি হইতে অনূদিত তাহা অভিভাষণের নিম্নে লিখিত আছে। এই অনুবাদ-কার্য্যে সহায়তার জন্য আমি 'বঙ্গবাণীর' সহ-সম্পাদক শ্রীশচীন্দ্রলাল ঘোষ ও শ্রীবিরজানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। পুস্তকখানি জনপ্রিয় হইলে সুভাষবাবুর রাষ্ট্রসম্পর্কীয় বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলীও একত্রে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। নিবেদন ইতি— ৫শে কার্ত্তিক ১৩৩৭। বিনীত—

শ্রীগোপাল লাল সান্যাল।

সুচীপত্র

ছাত্র-আন্দোলন

যুব-আন্দোলন

নূতনের সন্ধান

ছাত্র আন্দোলন

"ছাত্র জীবনের উদ্দেশ্য শুধু পরীক্ষা পাশ ও স্বর্ণপদক লাভ নহে—দেশ সেবার জন্য প্রাণের সম্পদ ও যোগ্যতা অর্জ্জন করা। দেশ মাতৃকার চরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিব—ইহাই একমাত্র সাধনা হওয়া উচিত; এই সাধনার আরম্ভ ছাত্র-জীবনেই করিতে হইবে।"

*

* *

ছাত্রমণ্ডলী যদি আমাকে তাদের মধ্যেই একজন বিবেচনা করিয়া সভাপতি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি তাহাদের নিকট বাস্তবিকই কৃতজ্ঞ। আমি তাহাদের শ্রদ্ধা চাই না, কারণ শ্রদ্ধার যোগ্য আমি নই; আমি চাই তাদের ভালবাসা, আমি চাই তাদের আপন হতে। আমাকে আপন বোধ করিয়া তাহারা সভাপতি করিয়া থাকিবে আমার এখানে আসা সার্থক হইয়াছে।

আমি ছাত্রদের ভালবাসি। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে তাহাদের মনোভাব, তাহাদের সুখ-দুঃখ, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা আমি বুঝি। ছাত্র-জীবনে কি লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহিতে হয় তাহার অভিজ্ঞতা আমার আছে। তাই লাঞ্ছিত ছাত্র-সমাজের মর্ম্মের ব্যথা আমি উপলব্ধি করিতে পারি।

যে সমাজে ছাত্রেরা শ্রদ্ধা ও সম্মান পায় না—যে সমাজে ছাত্রেরা শিশুবৎ, কেবল কৃপার ও উপদেশের পাত্র—সে সমাজে মনুষ্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। আমরা মুখে বলি—"প্রাপ্তে তু ষোড়শবর্ষে পুত্র মিত্র বদাচরেৎ"—কিন্তু ব্যবহারে বয়স্ক পুত্রকে শিশুজ্ঞান করিয়া থাকি, যদিও সে পুত্র সাবালক হইয়া বি, এ, এম্, এ, পাশ করিয়াছে। চল্লিশ বৎসর প্রাপ্ত হইয়াও পুত্র খোকার ন্যায় ব্যবহার পায়—এরূপ ঘটনা বিরল নয়। আর দুঃখের বিষয় এই, আমরা এরূপ ব্যবহারে লজ্জা বোধ না করিয়া গৌরব অনুভব করিয়া থাকি! প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যাহাদের নাবালকত্ব ঘুচে না, তাহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সাইমন কমিশন এদেশে আসিলে কি বিস্মিত হইবার কোনও হেতু আছে?

হিন্দুজাতি ত গর্ব্ব করিয়া থাকে যে তাহারা মাতৃমূর্ত্তির ভিতর দিয়া ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকে এবং তাহারা বাল-গোপাল রূপের মধ্যে ভগবানকে পাইয়াছে। কিন্তু আমি হিন্দুজাতিকে জিজ্ঞাসা করি, একবার বুকে হাত দিয়ে বলুন—"আমাদের সমাজে বর্ত্তমান সময়ে ঘরে এবং বাহিরে আমরা মাতৃজাতির সম্মান রক্ষা করিতে পারিতেছি কিনা—এবং আমাদের সমাজে বালক ও যুবকেরা মনুষ্যোচিত ব্যবহার পায় কি না?"

মাতৃজাতির সম্মান যদি আমরা রক্ষা করিতে পারিতাম তাহা হইলে বাঙলার জেলায় জেলায় দিনের পর দিন নারী-সমাজের উপর শত লাঞ্ছনা ও অত্যাচার ঘটিত না এবং ঘটিলেও আমাদের পুরুষ-সমাজ অম্লান বদনে ও নিশ্চিন্ত মনে তাহা সহ্য করিত না।

আজ যদি বাঙ্গলা দেশে পুরুষ থাকিত তাহা হইলে মাতৃজাতির অসম্মান দেখিয়া তাহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইত এবং বীরশ্রেষ্ঠ খড়্গ বাহাদুর সিংহের মত প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া মাতৃজাতির সম্মান রক্ষার্থে কর্ম্ম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিত।

হে ছাত্রবৃন্দ, ইংরাজকে তোমরা হয় তো ঘৃণা করিয়া থাক—কিন্তু আমি বলি, ইংরাজ যেরূপ তাহার নারীজাতির সম্মান করিতে জানে, তাহা শিক্ষা কর ইংরাজের নিকট। তোমার দেশে তোমার মা ও ভগিনীর মর্য্যাদা রক্ষা হয় না—আর মুষ্টিমেয় ইংরাজ এই দেশে তেত্রিশ কোটি বিদেশীর মধ্যে ইংরাজ মহিলার সম্মান কি করিয়া রাখে? তাহার কারণ এই যে, একজন ইংরাজ মহিলার উপর অত্যাচার হইলে সমস্ত ইংরাজজাতি পাগলপ্রায় হয় এবং সে অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সমগ্র জাতি বদ্ধপরিকর হয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মিস্ এলিসের পাঠান কর্ত্তৃক অপহরণের ঘটনা হয় তো আপনাদের স্মরণ আছে।

আমরা মুখে বলি, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সি"। কিন্তু সমস্ত প্রাণ দিয়া কি আমরা জননী ও জন্মভূমিকে ভালবাসি? জননীকে ভালবাসার অর্থ শুধু নিজের প্রসূতিকে ভালবাসা নয়, সমস্ত মাতৃজাতিকে ভালবাসা। বাঙ্গলা দেশ—বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস, বাঙ্গলার শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রাণধর্ম্ম বাঙ্গলার নারীজাতির মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। যে ব্যক্তি বাঙ্গলার মাতৃজাতিকে শ্রদ্ধা করিতে জানে না—সে বাঙ্গলা দেশকে কি করিয়া শ্রদ্ধা করিবে? যে ব্যক্তি বাঙ্গলা

দেশকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে না—ভালবাসে না—সে কি করিয়া মানুষ হইবে? মহান আদর্শকে যে ভালবাসে না—যে পাত্রে সেই আদর্শ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে—সে পাত্রকে যে ভালবাসে না—সে ব্যক্তি কোনও দিন মানুষ হইতে পারিবে না। জীবনে যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু কল্যাণকর—সে সবের সমাবেশ আমরা করিয়া থাকি, দেশমাতৃকার অপরূপ রূপের মধ্যে এবং ত্রিলোকজয়ী ভুবন-মনোমোহিনী মাতৃমূর্ত্তিতে। অতএব হে ভ্রাতৃমণ্ডলী, মায়ের আরাধনা করিতে শিখ; মাতৃজাতিকে ভক্তি কর, শ্রদ্ধা কর; নিজের দেশে মাতৃজাতির সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হও।

মনে রাখিও সেই কথা—যাহা বহুযুগ পূর্ব্বে মনু বলিয়াছিলেন :—

> "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
> যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
> শোচন্তি যাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং।
> ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বিবর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥

"যেখানে নারী পূজিতা হন তথায় দেবতারা আনন্দলাভ করিয়া থাকেন; যেখানে নারীর সম্মান নাই, সে দেশে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড একেবারে বিফল। যে কুলে নারীরা শোক করিয়া থাকেন (বা উৎপীড়িতা হইয়া থাকেন) সে কুল অতি শীঘ্র বিনষ্ট হয় এবং যে কুলে তাহাদের কোনও দুঃখ, কষ্ট, শোক নাই—সে কুলের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে।" যে যুগে এ দেশে নারীজাতির

সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল, সে যুগে মৈত্রেয়ী, গার্গীর মত ঋষিপত্নী জন্মিয়াছিল, সে যুগে খনা, লীলাবতীর মত বিদূষীর আবির্ভাব হইয়াছিল, অহল্যাবাই ও ঝান্সীর রাণীর মত বীর-রমণীর অভ্যুদয় হইয়াছিল। এ সোণার বাঙ্গলায়ও আমরা একদিন রাণীভবানী দেবীচৌধুরাণীর মত রমণী দেখিয়াছিলাম।

আমার ছাত্রবন্ধুরা হয় তো আশ্চর্য্য হইতেছেন যে, ছাত্র সম্মিলনীতে আমি এ সব কথার অবতারণা কেন করিতেছি? কিন্তু বড ব্যথা পাইয়া একথা আমি আজ বলিতে বাধ্য হইয়াছি। নারী সমাজ যে পর্য্যন্ত বীর-প্রসূ না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত আমরা জাতি হিসাবে মানুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিব না। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমরা ঘরে ও বাহিরে মাতৃ-জাতিকে সম্মান ও গৌরবের আসনে না বসাইতেছি সে পর্য্যন্ত এ দেশের নারী-জাতি বীর প্রসবিনী হইতে পারেন না। আমাদের মাতৃজাতিকে আমরা যদি শক্তিরূপিণী করিতে চাই তাহা হইলে বাল্য-বিবাহ প্রথা উচ্ছেদ করিতে হইবে; স্ত্রীজাতিকে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালনের অধিকার দিতে হইবে; উপযুক্ত স্ত্রী শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে; অবরোধ প্রথা দূর করিতে হইবে; বালিকা ও তরুণীদের ব্যায়াম শিক্ষার এবং লাঠি ও ছোরা খেলা শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে—এমন কি স্বাবলম্বী হইবার মত অর্থকরী শিক্ষাও দিতে হইবে, এবং বিধবাদের পুনর্ব্বিবাহের অনুমতি দিতে হইবে।

যদি এই সব নীতি কার্য্যে পরিণত করিতে হয় তাহা হইলে সে ভার যুবকদের গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ বহুযুগ সঞ্চিত

কুসংস্কার বশতঃ 'যাহারা ধর্ম্ম ও লোকাচারকে অভিন্ন জ্ঞান করেন, সেই সব প্রাচীন পন্থীরা হয় তো এ কাজে বিশেষ বাধা প্রদান করিবেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাষ্ট্রীয় বিপ্লব করা বরং সহজ কিন্তু সামাজিক বিপ্লব বা সংস্কার সাধন করা তদপেক্ষা কঠিন। কারণ রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সময়ে লড়াই করিতে হয় শত্রুর সঙ্গে এবং এই কার্য্যে পাওয়া যায় জাতি ও মত নির্ব্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর সহানুভূতি। মধ্যে মধ্যে কারাযন্ত্রণা ও অন্যান্য অত্যাচার সহিতে হয় বটে কিন্তু সমগ্র দেশবাসীর ভালবাসা ও সহানুভূতি লাঞ্ছিত সেবককে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে। সামাজিক বিপ্লবের চেষ্টা যাহারা করে তাহাদের বিপদ অন্য প্রকার। তাহাদের লড়াই করিতে হয়—দেশবাসীর সঙ্গে, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে। নিজের ঘরে তাহাদিগকে দিবারাত্রি লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহিতে হয় এবং অখণ্ড সমাজের সহানুভূতি তাহারা কোনও দিন পায় না। আত্মীয় স্বজনের সহিত, গুরুজনের সহিত বিবেক-প্রণোদিত হইয়া বিরোধ করিতে অনেক সময়ে মানুষের অবস্থা কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গনে অর্জ্জুনের অবস্থার মত হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং এরূপ সংগ্রামে অপূর্ব্ব শক্তি, সাহস ও তেজ চাই। হে বন্ধুগণ, সে শক্তির সাধনা তোমরা কর।

আমি গোড়ায় বলিয়াছি যে, আমাদের দেশে এখনও যুবক-সমাজ ও ছাত্র-সমাজ তাহার যোগ্য আসন পান নাই। অভ্যাসের দরুণ আমরা আমাদের অবস্থা উপলব্ধি করি না। কিন্তু স্বাধীন দেশে আমরা যখন যাই তখন সেখানকার

অবস্থার সহিত নিজের অবস্থা তুলনা করিয়া আমাদের চক্ষু উন্মীলিত হয়। স্বাধীন দেশের ছাত্রসমাজ অভিভাবকদের নিকট, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট, পুলিশের নিকট, গবর্ণমেণ্টের নিকট, এবং সমাজের নিকট যে সমাদর—এমন কি শ্রদ্ধা পাইয়া থাকে তাহা আমাদের অনেকের কল্পনার বাহিরে। আর আমাদের ছাত্রেরা নিজেদের ঘরে কৃপার পাত্র, বিদ্যালয়ে উপদেশের ও শাসনের পাত্র, সমাজে নাবালকের তুল্য এবং পুলিশ ও গবর্ণমেণ্টের নিকট নিত্য অবিশ্বাসের পাত্র। এই অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা ও শাসনের ভিতর মনুষ্যত্বের উদ্বোধন কি করিয়া সম্ভব? স্বাধীন দেশের ছাত্র-সমাজ যে সমাদর ও শ্রদ্ধা পায় তাহার ফলে তাহাদের দায়িত্ববোধ ফুটিয়া উঠে, কর্তব্য-বুদ্ধি জাগরিত হয় এবং তাহাদের অন্তর্নিহিত দেবত্বের স্ফূরণ হয়। আমাদের সমাজের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ এই যে আমাদের ছাত্রেরা যেরূপ ব্যবহার পাইয়া থাকে তাহা মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক বা অনুকূল নয়।

তবে আশার কথা এই যে, এখানকার ছাত্রেরা আর নিশ্চেষ্ট নয়। সমাজের অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া তাহারা নিজেদের উদ্ধার-সাধনে ব্রতী হইয়াছে। তাই আজ সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন আমরা দেখিতে পাইতেছি। ছাত্র-সমাজ নিজেদের উদ্ধার সাধন করিয়া নূতন সমাজ সৃষ্টি করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে। আমি আশা করি ও বিশ্বাস করি যে, যে সমাদর ও শ্রদ্ধা স্বাধীন দেশের ছাত্রসমাজ সমস্ত দেশের নিকট পাইয়া থাকে, সে সমাদর ও শ্রদ্ধা এ দেশের ছাত্রসমাজও ক্রমশঃ

অর্জ্জন করিবেন—নিজের শক্তি, সাধনা ও যোগ্যতার বলে ; শ্রীযুক্ত খড়্গ বাহাদুর সিংহের মত ছাত্র আজ সমস্ত দেশ ও সকল শ্রেণীর নিকট শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জ্জন করিয়াছে নিজের সাহস, ত্যাগ ও শক্তির বলে। ঠিক এমনই ভাবে বাঙ্গলার ছাত্রসমাজ ক্রমশঃ আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

মানুষের উন্নতির পথে সর্ব্বাপেক্ষা বড় অন্তরায় ভ্রান্ত আদর্শ। মানুষ যখন কোনও সৎ বা অসৎ কাজ করে, তখন সে কোন নীতির দোহাই দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চায়। বর্ত্তমান ছাত্রসমাজ কতকগুলি ভ্রান্ত আদর্শ গ্রহণ করিয়া তারই সাহায্যে অন্যায় আচরণ করে এবং অন্যায় আচরণের প্রশ্রয় দেয়। উদাহরণস্বরূপ আমি একটি কথার উল্লেখ করিতে পারি যাহা আমরা প্রায়ই শুনিয়া থাকি—"ছাত্রাং অধ্যয়নং তপঃ"—অধ্যয়নই ছাত্র-জীবনের তপস্যা। এই বচনের দোহাই দিয়া ছাত্রদিগের দেশসেবার কার্য্য হইতে নিরস্ত রাখিবার চেষ্টা অনেকেই করিয়া থাকেন।

অধ্যয়ন কোনও দিন তপস্যা হইতে পারে না। অধ্যয়নের অর্থ কতকগুলি গ্রন্থ পাঠ ও কতকগুলি পরীক্ষা পাশ। ইহার দ্বারা মানুষ স্বর্ণপদক লাভ করিতে পারে—হয় তো বড় চাকুরী পাইতে পারে—কিন্তু মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে পারে না। পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা উচ্চভাব বা আদর্শ শিক্ষা করিতে পারি—এ কথা সত্য কিন্তু সে সব ভাব যে পর্য্যন্ত আমরা উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া কার্য্যে পরিণত না করিতেছি সে পর্য্যন্ত আমাদের চরিত্র গঠন হইতে পারে না। তপস্যার উদ্দেশ্য সত্যকে উপলব্ধি করা—শ্রবণ, মনন

নিদিধ্যাসন প্রভৃতি উপায়ে তদ্‌ভাবভাবিত হইয়া সত্যের সহিত মিশিয়া যাওয়া। সে অবস্থায় মানুষ যখন পৌছায় তখন তাহার জীবনের রূপান্তর হয়। সে তখন জীবনের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে এবং অন্তর্লব্ধ নূতন শক্তি ও আলোকের দ্বারা সে নূতন পথে নূতন ভাবে তাহার জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। এরূপ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে অল্প বয়স হইতেই কাজ আরম্ভ করা আবশ্যক। যখন মানুষের অদম্য শক্তি ও উৎসাহ আছে, অফুরন্ত কল্পনা-শক্তি ও ত্যাগস্পৃহা আছে, নিস্বার্থ ভাবে মানুষ যখন ভাল-বাসিতে পারে—তখনই সে আদর্শের চরণে আত্মবলিদান করিতে পারে—অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া ভাবের তরঙ্গে জীবনতরী ভাসাইয়া দিতে পারে।

সুতরাং কৈশোর ও যৌবনই সাধনার প্রকৃষ্ট সময়। টাট্‌কা রাঙ্গা ফুলেই দেবীর আরাধনা হইয়া থাকে, পুরাণো বাসি ফুলের দ্বারা সে পূজার কাজ সমাধা হইতে পারে না। তাই বলি হে আমার তরুণ ভাই সব, তোমাদের হৃদয় যখন পবিত্র, শক্তি যখন অফুরন্ত, উৎসাহ যখন অদম্য এবং ভবিষ্যৎ জীবন যখন আশার রক্তিম-রাগে রঞ্জিত, সেই শুভ সময়ে জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের চরণে আত্মোৎসর্গ কর।

সে আদর্শ কি—যাহার প্রেরণায় মানুষ অমৃতের সন্ধান পায়, বিপুল আনন্দের আস্বাদ পায়, অসীমাশক্তির পরিচয় পায়। সে আদর্শ কি—যাহার পুণ্যপরশে দেশে দেশে যুগে যুগে মহাপুরুষের সৃষ্টি হইয়া থাকে। তোমরা হয়তো মনে কর যে মহাপুরুষেরা

বড় হইয়াই জন্মায়—তাঁহাদিগকে চেষ্টা করিয়া পরিশ্রম করিয়া বা সাধনা করিয়া বড় হইতে হয় না। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। মহাপুরুষেরা মহত্ত্ব লাভের সম্ভাবনা লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সাধনা ব্যতীত তাঁহারা সে মহত্ত্বের বিকাশ সাধন করিতে পারেন না বা সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহাপুরুষের আসন গ্রহণ করিতে পারেন না। যত মহাপুরুষ এ পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনী যদি বিশ্লেষণ কর তাহা হইলে দেখিবে যে প্রত্যেকেব জীবনে আছে অসীম অধ্যবসায়, অক্লান্ত চেষ্টা, গভীর সাধনা ও অবিরত পরিশ্রম। তোমরা যদি সেরূপ চেষ্টা ও সাধনা করিতে পার তাহা হইলে তোমরাও একদিন মহাপুরুষের আসনে বসিতে পারিবে। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় অসীম শক্তি আছে। সাধনার দ্বারা সে ভস্মরাশি অপনীত হইবে এবং অন্তরের দেবত্ব কোটী সূর্য্যের উজ্জ্বলতার সহিত প্রকাশিত হইয়া মনুষ্য-সমাজকে মুগ্ধ করিবে।

যে আদর্শকে আশ্রয় করিয়া বাঙ্গলার তরুণ ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে তাহার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের নব বর্ষের গানের মধ্যে পাওয়া যায়। তাই কবির ভাষায় বলি—

"হে ভারত, আজ নবীন বরষে—
শুন এ কবির গান
তোমার চরণে নবীন হরষে
এনেছি পূজার দান।

এনেছি মোদের দেহের শকতি
এনেছি মোদের মনের ভকতি
এনেছি মোদের ধর্ম্মের মতি
এনেছি মোদের প্রাণ।
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য
তোমারে করিতে দান।"

দেশমাতৃকার চরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিব—ইহাই একমাত্র সাধনা হওয়া উচিত। এই সাধনার আরম্ভ ছাত্রজীবনেই হওয়া উচিত। দান করিবার মত সম্পদ, অর্জ্জন ও সঞ্চয় করিতে হইবে ছাত্রজীবনেই। শরীরে যাহার বল আছে, মনে যাহার সাহস ও তেজ আছে, শিক্ষা দীক্ষা যে পাইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য সাধনে যে ব্রতী হইয়াছে—সে ব্যক্তির দিবার মত সম্বল আছে। যে ভিক্ষুক, যে নিতান্ত দীন হীন, তাহার দানের কোনও অর্থ নাই; সে নিজেই কৃপার পাত্র। ছাত্রজীবনে শারীরিক বল সঞ্চয় করিতে হইবে ও চরিত্র গঠন করিতে হইবে এবং জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে; এক কথায় শরীর, মন ও হৃদয় এই তিন দিক দিয়া জীবনের বিকাশ সাধন করিয়া মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে হইবে।

দেশসেবার জন্য প্রাণের সম্পদ ও যোগ্যতা অর্জ্জন করা যদি ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে পরীক্ষা পাশ ও স্বর্ণপদক লাভের মূল্য যে কতটা তাহা আপনারা সহজে অনুমান করিতে পারেন। আজকাল স্কুল ও কলেজে "ভাল ছেলে" নামে একশ্রেণীর জীব দেখিতে পাওয়া যায়; আমি তাহাদিগকে কৃপার চক্ষে

দেখিয়া থাকি। তাহারা গ্রন্থকীট—পুঁথির বাহিরে তাহাদের অস্তিত্ব নাই এবং পরীক্ষার প্রাঙ্গণে তাহাদের জীবন পর্য্যবসিত হয়। ইহাদের সহিত তুলনা করুন—"বকাটে" রবার্ট ক্লাইভকে। এই "বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো" ছেলে সাত-সমুদ্র তের নদী পার হইয়া অজানার সন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে ইংরাজ জাতির জন্য সাম্রাজ্য জয় করে! ইংলণ্ডের ভাল ছেলেরা যাহা করিতে পারে নাই, করিতে পারিত না তাহা সম্পন্ন করিল "বকাটে" রবার্ট ক্লাইভ। ইংরাজ জাতি মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রাখিতে জানে তাই তাহারা সর্ব্বোচ সম্মান ক্লাইভকে কৃতজ্ঞচিত্তে অর্পণ করিল। "বকাটে" রবার্ট শেষ জীবনে হইল লর্ড ক্লাইভ!

ইংরাজ—তথা পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত জাতি যত দিক দিয়া যত উন্নতি করিয়াছে তাহার কারণ যদি বিশ্লেষণ করেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে তাহাদের দুইটী অপূর্ব্ব গুণ আছে যাহার বলে তাহারা সকল জাতির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে। প্রথমতঃ তাহারা আপন দেশকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে এবং দ্বিতীয়তঃ তাহাদের spirit of adventure আছে। নূতনের আকর্ষণে তাহারা গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করিতে পারে। বাহিরের টানে তাহারা ঘর ছাড়িতে পারে; সংসারের আকর্ষণে তাহারা চিরাচরিত রীতি ও প্রথা বর্জ্জন করিতে পারে। এই নির্ভীকতা, গতিশীলতা ও "সুদূরের পিয়াস" আছে বলিয়াই ইংরাজ আজ এত উন্নত; ইহার অভাবে আমরা আজ এত দীন, হীন, ও পঙ্গু।

কিন্তু চিরকাল আমাদের এমন অবস্থা ছিল না। আমরাও একদিন উত্তাল তরঙ্গমালাসঙ্কুল সমুদ্র পার হইয়া দেশদেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছি, জ্ঞানালোক বিকীরণ করিয়াছি এবং শিল্পসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করিয়াছি। সে ছিল আমাদের সম্প্রসারণের যুগ, আত্ম বিকাশের যুগ, উত্থানের যুগ। তারপর আসিল সঙ্কোচনের যুগ, আত্মসুপ্তির যুগ, পতনের যুগ। আজকাল আবার জীবনের স্পন্দন আমরা অনুভব করিতেছি; পতনের পর আবার উত্থান আরম্ভ হইয়াছে, তাই সুপ্তিভঙ্গের ও নব-জাগরণের সমস্ত লক্ষণ চারিদিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তি আবার জাগিয়া উঠিয়াছে, বাহির হইতে জ্ঞান ও সম্পদ আহরণের জন্য আমরা উৎসুক হইয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঘরে সম্পদ যাহা কিছু আছে বিশ্ব-দরবারে নিবেদন করিবার জন্য আমরা পাগল হইয়াছি। তাই কবি গাহিয়াছিলেন :—

আমি ঢালিব করুণা ধারা
আমি ভাঙ্গিব পাষাণ কারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।

* * *

শিখর হইতে শিখরে ছুটিব
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব
হেসে খল খল, গেয়ে কল কল
তালে তালে দিব তালি।

তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া
নব নব দেশে বারতা লইয়া
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান ॥

ব্যক্তিগত যোগ্যতার দিক দিয়া ভারতবাসী আমরা পৃথিবীর অন্য কোনও জাতি অপেক্ষা কোনও বিষয়ে নিকৃষ্ট নহি; বরং আমরা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। আমাদের পরাধীনতা ও বর্ত্তমান দুর্দ্দশা সত্ত্বেও আমাদের কবি, আমাদের সাহিত্যিক, আমাদের শিল্পী, আমাদের বৈজ্ঞানিক, আমাদের কর্ম্মী, আমাদের বণিক, আমাদের যোদ্ধা, আমাদের খেলোয়াড়, আমাদের কুস্তিগীর পালোয়ান—পৃথিবীর অন্য কোনও জাতি অপেক্ষা হীন নয়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আমরা বার বার আমাদের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছি।

কিন্তু আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক দিয়া পৃথিবীর সমক্ষে গৌরব ও সম্মান লাভ করিলেও একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমরা জাতি হিসাবে এখনও অধঃপতিত। জনসাধারণকে আমরা যেদিন শিক্ষার দ্বারা মানুষ করিয়া তুলিতে পারিব সে দিন আমাদের সম্মুখে অন্য কোনও জাতি প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে না। জনসাধারণকে জাগাইতে হইলে সে ভার শিক্ষিত তরুণ সমাজকে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকৃত দেশাত্মবোধ যেদিন আমাদের মধ্যে জাগিবে সেদিন আমরা জনসাধারণের সহিত প্রাণে প্রাণে মিশিতে

পারিব। দেশাত্মবোধ লাভ করিতে হইলে হৃদয়ের উদারতা চাই এবং চিন্তার সকল বন্ধন ও গণ্ডী অতিক্রম করা চাই। স্বাধীন চিন্তার শক্তি ও হৃদয়ের অপরিসীম উদারতা যাহাতে তরুণসমাজ লাভ করিতে পারে তার জন্য ছাত্রজীবন হইতেই সাধনা করা চাই।

মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায় মনুষ্যত্ব বিকাশের সকল অন্তরায় চূর্ণ বিচূর্ণ করা। যেখানে যখন অত্যাচার, অবিচার ও অনাচার দেখিবে সেইখানে নির্ভীকহৃদয়ে শির উন্নত করিয়া প্রতিবাদ করিবে এবং নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। বর্ত্তমান যুগে আত্মরক্ষার জন্য এবং জাতির উদ্ধারের জন্য যে শক্তি আমরা চাই তাহা বনে জঙ্গলে বা নিভৃত কন্দরে তপস্যা করিলে পাইব না—পাইব নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারা—পাইব আবার সংগ্রামের ভিতর দিয়া। অত্যাচার দেখিয়াও যে ব্যক্তি তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করে না সে নিজের মনুষ্যত্বের অপমান করে এবং অত্যাচরিত ব্যক্তির মনুষ্যত্বেরও অপমান করে। যে ব্যক্তি অত্যাচার নিবারণের প্রচেষ্টায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিপন্ন হয়, কারারুদ্ধ হয়, অথবা লাঞ্ছিত হয়—সে সেই ত্যাগ ও লাঞ্ছনার ভিতর দিয়া মনুষ্যত্বের গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই আজি তোমাদের মতই একজন ছাত্র খড়্গ বাহাদুর সিংহ মাতৃ-জাতির সম্মান রক্ষার পুরস্কারস্বরূপ বরেণ্য বীররূপে ভারতপূজ্য হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর যে সব Gold medallist ছাত্র বাহির হইতেছে সেইরূপ এক হাজার

ছাত্র একত্র করিলেও একজন খড়্গা বাহাদুর তৈয়ারী হইবে না।

স্কুলে, কলেজে, ঘরে, বাহিরে, পথে, ঘাটে, মাঠে যেখানে অত্যাচার, অবিচার বা অনাচার দেখিবে সেখানে বীরের মত অগ্রসর হইয়া বাধা দাও—মুহূর্ত্তের মধ্যে বীরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে —চিরকালের জন্য জীবনের স্রোত সত্যের দিকে ফিরিয়া যাইবে —সমস্ত জীবনটাই রূপান্তরিত হইবে। আমি আমার ক্ষুদ্র জীবনে শক্তি কিছু যদি সংগ্রহ করিয়া থাকি তাহা শুধু এই উপায়েই করিয়াছি।

আর একটী কথা বলিয়া আমার আজিকার বক্তব্য আমি শেষ করিব। ছাত্র সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। তাহারা যে ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী, দেশের উদ্ধার যে তাহাদেরই করিতে হইবে এবং উদ্ধার করিবার শক্তি ও সামর্থ্য যে তাহাদের আছে— একথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। ছাত্রসমাজকে আত্ম-বিশ্বাস ফিরিয়া পাইতে হইবে। নিজের উপর বিশ্বাস এবং জাতির উপর বিশ্বাস না পাইলে মানুষ কোনও বড় কাজ করিতে পারে না। বাঙ্গলার তরুণসমাজের উপর, ছাত্রসমাজের উপর আমার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অপরিসীম, আমি তাদের অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি—তাই তারাও আমাকে ভালবাসে। ছাত্রবন্ধুগণ! তোমাদের মধ্যে কি অসীম শক্তি নিহিত আছে তাহার সংবাদ তোমরা না রাখিলেও আমি রাখি। তোমাদের আত্মবিস্মৃতি যে দিন ঘুচিবে, তোমরা আত্মবিশ্বাস যে দিন ফিরিয়া পাইবে, সাধনার দ্বারা

তোমরা যে দিন মরণজয়ী হইবে, সেদিন তোমরা অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে।

আমি ইচ্ছা করিয়াই এই অভিভাষণের মধ্যে বিদেশের ছাত্র আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু বলিলাম না। নানা পুস্তকে ও পত্রিকায় সে সব সংবাদ পাইবে। আমি এখানে শিক্ষকের কাজ করিতে আসি নাই। আমি আসিয়াছি আমার হৃদয়ের অনুভূতি ও জীবনের অভিজ্ঞতা তোমাদের সম্মুখে নিবেদন করিতে। নিজেদের মধ্যে esprit d'corps বা সঙ্ঘবদ্ধতার অনুশীলন করিতে হইবে—ছাত্রগণের সময়োপযোগী গান বাঁধিতে হইবে, পত্রিকা প্রণয়ন করিতে হইবে, পতাকা সৃষ্টি করিতে হইবে এবং সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইবে। ছাত্রদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী নব্য প্রণালীতে গঠন করিতে হইবে—যেমন কলিকাতা কংগ্রেসের সময় করা হইয়াছিল। Volunteer Organisation-এর সাহায্যে ছাত্রেরা নির্ভীক ও শ্রমসহিষ্ণু হইবে এবং শিক্ষা করিবে শৃঙ্খলা ও আজ্ঞানুবর্ত্তিতা। এই সব উপায়ে ছাত্রসমাজে প্রীতি ও সহযোগিতার ভিতর দিয়া সংহতশক্তির উদ্ভব হইবে এবং class patriotism-এর সৃষ্টি হইবে। এখন আমাদের ছাত্রদলের মধ্যে এই class patriotism-এর আবশ্যকতা হইয়াছে। ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত ছাত্রদের প্রাণ এক সুরে বাঁধিতে হইবে। এব সংহত ছাত্রশক্তির সম্মুখে কোনও বাধা বিঘ্ন দাঁড়াইতে পারিবে না। জাগ্রত ছাত্রশক্তি সকল বন্ধন হইতে স্বজাতিকে মুক্ত করিয়া স্বাধীন ভারত সৃষ্টি করিবে এবং বিশ্বের দরবারে ভারতবাসীর জন্য গৌরবময় আসন লাভ করিবে।

ভ্রাতৃবৃন্দ আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। আমি ছাত্র ছিলাম এখনও ছাত্র আছি। আমি তোমাদেরই একজন। আমার অন্তরের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা তোমরা গ্রহণ কর।

গত ১৩ই বৈশাখ শুক্রবার, ১৩৩৬ শ্রীহট্টে সুর্ম্মা উপত্যকা ছাত্র সম্মিলনের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অনিবার্য কারণে তথায় গমন করিতে না পারিয়া তিনি তাঁহার লিখিত অভিভাষণ তথায় পাঠাইয়া দেন; সম্মিলনের সভাপতি তাহা সম্মিলনে পাঠ করিয়াছিলেন। উপরে তাহা প্রকাশিত হইল।

দুই

"প্রত্যেক ব্যক্তির বা জাতির একটা ধর্ম্ম বা আদর্শ আছে। সেই আদর্শকে অবলম্বন ও আশ্রয় করিয়া সে গড়িয়া উঠে। সেই আদর্শকে সার্থক করাই তার জীবনের উদ্দেশ্য এবং সেই আদর্শকে বাদ দিলে তার জীবন অর্থহীন ও নিষ্প্রোজন হইয়া যায়।"

আপনারা আজ কিসের জন্য এই ছাত্রসভায় আমায় আহ্বান করিয়াছেন তাহা আপনারাই জানেন। তবে সভায় আসিবার প্রবৃত্তি বা সাহস যে আমার হইয়াছে তার একমাত্র কারণ এই যে আমি মনে করি আমি আপনাদের মতই ছাত্র; "জীবন বেদ"

আমি অধ্যয়ন করিয়া থাকি এবং বাস্তব জীবনের কঠিন আঘাতে যে জ্ঞানের উন্মেষ হয় সেই জ্ঞান আহরণে আমি এখন রত।

প্রত্যেক ব্যক্তির বা জাতির একটা ধর্ম্ম বা আদর্শ (ideal) আছে। সে ideal বা আদর্শকে অবলম্বন ও আশ্রয় করিয়া সে গড়িয়া উঠে। সেই idea কে সার্থক করাই তার জীবনের উদ্দেশ্য এবং সেই ideal বা আদর্শকে বাদ দিলে তার জীবন অর্থহীন ও নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। দেশ ও কালের গণ্ডীর মধ্যে আদর্শের ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তি এক দিনে বা এক বৎসরে হয় না। ব্যক্তির জীবনে সাধনা যেরূপ বহুবৎসর ব্যাপী হইয়া থাকে,জাতীর জীবনেও সেইরূপ সাধনার দ্বারা পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসে। তাই মনীষীরা বলিয়া থাকেন—আদর্শ একটা প্রাণহীন গতিহীন বস্তু নয়। তার বেগ আছে, গতি আছে, প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি আছে।

যে আদর্শ আমাদের সমাজে গত একশত বৎসর ধরিয়া আত্ম-বিকাশের চেষ্টা করিতেছে আমরা তার পরিচয় সব সময়ে না পাইতে পারি। যে চিন্তাশীল, যার অন্তর্দৃষ্টি আছে শুধু সে ব্যক্তি বাহ্য ঘটনা পরম্পর অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীরূপা এই আদর্শের ধারাকে ধরিতে পারে। এই আদর্শই আমাদের যুগধর্ম্ম—the idea of the age. ইহার উপলব্ধি হইলে মানুষ বুঝিতে পারে তার পথ কি, তার পথ প্রদর্শক কে। কিন্তু এই উপলব্ধি সব সময়ে হয় না বলিয়া আমরা প্রায়ই ভ্রান্ত পথের দিকে আকৃষ্ট হই এবং ভ্রান্ত গুরুর অনুবর্ত্তী হইয়া থাকি। হে ছাত্রমণ্ডলী, যদি জীবন গঠন করিতে চাও—তবে ভ্রান্ত গুরু ও ভ্রান্ত পথের প্রভাব হইতে

রক্ষা কর এবং নিজে আত্মস্থ হইয়া জীবনের প্রকৃত আদর্শ চিনিয়া লও।

১৫ বৎসর পূর্ব্বে যে আদর্শ বাঙ্গলার ছাত্রসমাজকে অনুপ্রাণিত করিত তাহা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ। সে আদর্শের প্রভাবে তরুণ বাঙ্গালী ষড়রিপু জয় করিবার স্বার্থপরতা ও সকল প্রকার মলিনতা হইতে মুক্ত হইয়া আধ্যাত্মিক শক্তির বলে শুদ্ধ বুদ্ধ জীবন লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইত। সমাজ ও জাতি গঠনের মূল—ব্যক্তিত্ব বিকাশ। তাই স্বামী বিবেকানন্দ সর্ব্বদা বলিতেন "man making is my mission"—খাঁটি মানুষ তৈয়ারী করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য।

কিন্তু ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে এত জোর দিলেও স্বামী বিবেকানন্দ জাতির কথা একেবারে ভুলিয়া যান নাই। কর্ম্মবিহীন সন্ন্যাসে অথবা পুরুষকারহীন অদৃষ্টবাদে তিনি বিশ্বাস করিতেন না। রামকৃষ্ণ পরমহংস নিজের জীবনের সাধনার ভিতর দিয়া সর্ব্ব ধর্ম্মের যে সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন তাহাই স্বামীজীর জীবনের মূল মন্ত্র ছিল এবং তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয়তার মূল ভিত্তি। এই সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয় ও সকল-মত-সহিষ্ণুতার প্রতিষ্ঠা না হইলে আমাদের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে জাতীয়তা-সৌধ নির্ম্মিত হইতে পারিত না।

বিবেকানন্দ-যুগের পূর্ব্বে যখন আমাদের দেশের নবযুগ প্রথম আরম্ভ হয় তখন আমাদের পথ প্রদর্শক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ধর্ম্মের নামে যে সব অধর্ম্ম চলিতেছিল এবং যে সব আবর্জ্জনা

ও কুসংস্কার ধর্ম্মের নামে সমাজ-দেহকে আচ্ছাদন করিয়াছিল এবং হিন্দু সমাজকে শতধা বিভক্ত করিয়াছিল, তাহা ধ্বংস করিবার জন্য রাজা রামমোহন কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। বেদান্তের সত্য প্রচারিত হইলে হিন্দু সমাজ-ধর্ম্মের বহিরাবরণ বর্জ্জন করিয়া সত্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে পারিবে এবং ভেদজ্ঞান ভুলিয়া আবার একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিবে, এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল। ধর্ম্মজগতে বিপ্লব আনিতে হইলে, আগে চিন্তা জগতে আলোড়ন উপস্থিত করা দরকার—তাই ভারতের চিন্তা-শক্তিকে জাগাইবার জন্য তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

ভারতকে জাগাইবার জন্য মনোরাজ্যে যে বিপ্লব রামমোহন প্রবর্ত্তিত করিলেন, পরবর্ত্তী যুগে সে বিপ্লব সমাজের মধ্যে আসিয়া পড়িল। কেশবচন্দ্রের যুগে সমাজ সংস্কারের কাজ দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজের নূতন বাণীর ফলে সমগ্র দেশে নব জাগরণ আরম্ভ হইল। কিছুকাল পরে যখন ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দু সমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়িল এবং হিন্দুসমাজের মধ্যেও জাগ-রণের সূচনা হইল তখন ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল।

রামমোহনের যুগ হইতে বিভিন্ন আন্দোলনের ভিতর দিয়া ভারতের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ প্রকটিত হইয়া আসিতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই আকাঙ্ক্ষা চিন্তারাজ্যে ও সমাজের মধ্যে দেখা দিয়াছিল কিন্তু রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে তখনও দেখা দেয় নাই—কারণ তখনও ভারতবাসী পরাধীনতার মহানিদ্রায় নিমগ্ন থাকিয়া মনে

করিতেছিল যে, ইংরাজের ভারত-বিজয় একটা দৈব ঘটনা বা divine dispensation. উনবিংশ শতাব্দির শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বাধীনতার অখণ্ড রূপের আভাস রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে পাওয়া যায়। "Freedom, freedom is the song of the soul," এই বাণী যখন স্বামীজীর অন্তরের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করিয়া নির্গত হয় তখন তাহা সমগ্র দেশবাসীকে মুগ্ধ ও উন্মত্তপ্রায় করিয়া তোলে। তাঁর সাধনার ভিতর দিয়া আচরণের ভিতর দিয়া কথা ও বক্তৃতার ভিতর দিয়া—এই সত্যই বাহির হইয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে যাবতীয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া খাঁটি মানুষ হইতে বলেন এবং অপরদিকে সর্ব্ব ধর্ম্মসমন্বয় প্রচারে ভারতের জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপন করেন। রামমোহন রায় মনে করিয়াছিলেন যে, সাকারবাদ খণ্ডন করিয়া এবং বেদান্তের নিরাকারবাদ প্রতিষ্ঠার দ্বারা তিনি জাতিকে একটা সার্ব্বভৌমিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে পারিবেন। ব্রাহ্ম সমাজও সেই পথে চলিয়াছিল কিন্তু ফলে হিন্দুসমাজ যেন আরও দূরে সরিয়া গেল। তার পর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মূলক বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ মূলক সত্য প্রচারের দ্বারা এবং সকল-মতসহিষ্ণুতার শিক্ষা দিয়া রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ জাতিকে একতাসূত্রে গাঁথিবার চেষ্টা করিলেন।

যে স্বাধীনতার অখণ্ড রূপ বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই তাহা বিবেকানন্দের যুগে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নাই। অরবিন্দের মুখে আমরা সর্ব্বপ্রথমে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বাণী শুনিতে পাই। অরবিন্দ যখন "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় লিখিলেন—"We

want complete autonomy free from British control'"—তখন স্বাধীনতাকামী তরুণ বাঙ্গালী বুঝিল যে, এতদিন পরে সে মনের মত মানুষ পাইয়াছে। ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিয়া বিভোর হইল। এখনও কানে বাজে সেই বাণী যাহা অরবিন্দ কলিকাতার মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া একদিন বলিয়াছিলেন :—

"I should like to see some of you becoming great; great, not for your own sake, but to make India great—so that she may stand up with head erect among the free nations of the world."

পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রেরণা পাইয়া বাঙালী জাতি ঝড় তুফান অগ্রাহ্য করিয়া, বিপ্লবের ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আমরা যখন আসিয়া পৌঁছিলাম তখন অসহযোগের বাণীর সাথে সাথে আমরা আর একটা কথা শুনিলাম মহাত্মা গান্ধীর মুখে—"জনসাধারণকে বাদ দিলে এবং তাহাদের মধ্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা না জাগাইতে পারিলে, স্বরাজ লাভ হইতে পারে না।" অসহযোগের পন্থা ভারতে বা বাঙ্গালা দেশে নূতন কিছু নয়। সেদিনও যশোহর জেলাবাসী এই পন্থা অবলম্বন করিয়া নীলকরের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু যে "গণবাণী" মহাত্মা গান্ধীর মুখে শোনা যায়, তাহা ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নূতন কথা।

এই বাণী আরও পরিস্ফুট হইয়াছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনে। তিনি তাঁহার লাহোরের বক্তৃতায় অতি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, যে স্বরাজ তিনি লাভ করিতে চান—তাহা মুষ্টিমেয় লোকের জন্য নহে—তাহা সকলের জন্য, জনসাধারণের জন্য। "Swaraj for the masses" এই আদর্শ তিনি নিখিল ভারতীয় শ্রমিক সভায় দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করেন।

আর একটা বাণী আমরা দেশবন্ধুর জীবনে পাই—সেটা এই যে মানুষের জীবন—জাতির এবং ব্যক্তির জীবন—একটা অখণ্ড সত্য। এই জীবনকে দ্বিধা বা বহুধা বিভক্ত করা যায় না। মানুষের প্রাণ যখন জাগে তখন তাহা সব দিক দিয়া জাগরণের পরিচয় দেয় এবং সর্ব্বক্ষেত্রে নবজীবনের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বজগৎ—তথা মানুষজীবন—বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই বৈচিত্র্যের লোপ সাধন করিলে জীবনের বিকাশ হইবে না—বরং আমরা মরণের বা ধ্বংসের নিকটবর্ত্তী হইব। তাই বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া, "বহুর" মধ্য দিয়া ব্যক্তির এবং জাতির বিকাশ সাধন করিতে হইবে।

বর্ত্তমান যুগে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ অধ্যাত্মিক জগতে "এক" এবং "বহুর" মধ্যে যে সমন্বয় স্থাপন করিয়াছিলেন—সে সমন্বয় দেশবন্ধু জাতির জীবনে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে করিয়াছিলেন বা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। দেশবন্ধু "শিক্ষার মিলনে" যেরূপ বিশ্বাস করিতেন "শিক্ষার বিরোধে"ও তদ্রূপ বিশ্বাস করিতেন —এক কথায় তিনি Federation of Cultures এ বিশ্বাস করিতেন এবং ভারতের মৌলিক একতায় প্রগাঢ় বিশ্বাসী হইলেও

বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্যে ও বিশ্বাসবান্ ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি ভারতবর্ষের পক্ষে Centralised State অপেক্ষা Federal State বেশী পছন্দ করিতেন।

যে সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশে দেশবন্ধু এত বিশ্বাসী ছিলেন তাহাই এই যুগের সাধনা। এই সাধনা সার্থক করিতে হইলে স্বাধীনতার অখণ্ড রূপ আগে দর্শন করা চাই। আদর্শের পরিপূর্ণ উপলব্ধি না হইলে মানুষ কর্ম্মক্ষেত্রে কখনও জয়যুক্ত হইতে পারে না। তাই আজ সারা ভারতকে এবং বিশেষ করিয়া ভারতের তরুণ সমাজকে বলিয়া দিতে হইবে যে, স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন আমরা দেখি—সে রাজ্যে সকলে মুক্ত, ব্যক্তি মুক্ত, সমাজও মুক্ত, সেখানে মানুষ রাষ্ট্রীয় বন্ধন হইতে মুক্ত, সামাজিক বন্ধন হইতে মুক্ত এবং অর্থের বন্ধন হইতে মুক্ত। রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতি—এই ত্রিতাপ হইতে আমরা মানব জাতিকে—দেশবাসীকে মুক্ত করিতে চাই।

যাহারা মনে করে যে, রাষ্ট্রীয় বন্ধন হইতে তাহারা দেশকে মুক্ত করিবে কিন্তু সমাজের পূর্ব্বাবস্থা বজায় রাখিবে—অথবা যাহারা মনে করে যে সামাজিক বন্ধন সব চূর্ণ করিবে কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কোনও বিপ্লব জানিবে না—তাহারা সকলেই ভ্রান্ত। বস্তুত শরীরে স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিলে প্রত্যেক অঙ্গে যেরূপ অপূর্ব্বশ্রী ফিরিয়া আসে তেমনি মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যখন জাতির অন্তরে জাগিয়া উঠে তখন তাহা সব দিক দিয়া ফুটিয়া বাহির হয়। জাতি যখন সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চায় তখন কেহ বলিতে পারে না—Thus far and no further.

আমাদের এই শত ছিদ্র-যুক্ত, পূতিগন্ধময় সমাজের দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতালাভ কোনও দিন হইবে না; পূর্ণ স্বাধীনতা (Complete Independence) লাভ করিতে হইলে সমস্ত জাতিকে মুক্তি-লাভের জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হইতে হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সামাজিক অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট অথবা অর্থনীতিক বৈষম্যে ভারাক্রান্ত, সে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য পাগল হইবে কেন? যার কাছে সামাজিক ও অর্থনীতিক অত্যাচারই সব চেয়ে বড় সত্য—সে ব্যক্তি এই সব অত্যাচার হইতে মুক্ত না হইতে পারিলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইবে কেন?

আজ এই কথাটী আমি খুব বড় করিয়া এখানকার ছাত্র সমাজের মধ্যে বলিতে আসিয়াছি—যে যুগে আপনারা জন্মিয়াছেন সে যুগের ধর্ম্ম—পরিপূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তিলাভ। স্বাধীন দেশে, স্বাধীন আব্‌হাওয়ার মধ্যে আমাদের জাতি জন্মিতে চায়—বর্দ্ধিত হইতে চায় এবং মরিতে চায়। "পুরুষ অবরুদ্ধ আপন দেশে, নারী অবরুদ্ধ নিজ নিবাসে"—এ অবস্থায় আর কত দিন চলিবে? আর আমাদের নারী সমাজের বর্ণনা করিবার সময়ে আমরা কত দিন আর বলিব—

"সচল হয়েও অচল সে যে
বস্তার চেয়েও ভারী,
মানুষ হয়েও সং-এর পুতুল
বঙ্গদেশের নারী।"

স্বাধীনতার নামে অনেকের আতঙ্ক উপস্থিত হয়। রাষ্ট্রীয়

স্বাধীনতার কথা ভাবিলে অনেকে স্বপ্ন দেখেন রক্ত-গঙ্গার এবং ফাঁসিকাষ্ঠের এবং সামাজিক স্বাধীনতার কথা ভাবিলে অনেকে দর্শন করেন উচ্ছৃঙ্খলার বিভীষিকা। কিন্তু আমি উচ্ছৃঙ্খলার ভয়ে ভীত নহি। মানুষের মধ্যে যদি ভগবান বিরাজ করেন, অথবা মানুষের মধ্যে যদি মানবতা থাকে—যদি ভগবান সত্য হন—যদি মানুষ সত্য হয়—তবে মানুষ চিরকাল পথভ্রষ্ট বা ভ্রান্ত হইতে পারে না। স্বাধীনতার মদিরা পান করিয়া যদি আমরা কিছু সময়ের জন্য অপ্রকৃতিস্থ হই তাহা হইলেও অচিরে আমরা আত্মস্থ হইব। আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির যে দাবী—তাহা ভুলভ্রান্তি করিবার অধিকারের দাবী বই আর কিছু নয় (the right to make mistakes), অতএব উচ্ছৃঙ্খলাও বিভীষিকা না দেখিয়া মুক্তপথে আগুয়ান হও; নিজের মানবতায় বিশ্বাসী হইয়া মনুষ্যত্ব লাভের চেষ্টায় সর্ব্বদা নিরত হও।

আজ দেশের মধ্যে তিনটী বড় সম্প্রদায় একপ্রকার নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে—নারী সমাজ, উপেক্ষিত তথা-কথিত অনুন্নত সমাজ এবং কৃষক ও শ্রমিক সমাজ। ইহাদের নিকট গিয়া বল—তোমরাও মানুষ, মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার তোমরাই পাইবে। অতএব ওঠো, জাগো, নিশ্চেষ্টতা পরিহার করিয়া নিজের অধিকার কাড়িয়া লও।

হে বাঙ্গলার ছাত্র ও তরুণ সমাজ! তোমরা পরিপূর্ণ ও অখণ্ড মুক্তির উপাসক হও। তোমরাই ভবিষ্য ভারতের উত্তরাধিকারী; অতএব তোমরাই সমস্ত জাতিকে জাগাইবার ভার গ্রহণ কর।

তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে—অনন্ত, অপরিসীম শক্তি। এই শক্তির উদ্বোধন কর এবং এই নবশক্তি অপরের মধ্যে সঞ্চারিত কর; তোমাদের নিকট নূতন স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত সমস্ত জাতি আবার বাঁচিয়া উঠুক।

যে দিন ভারত পরাধীন হইয়াছে—সেই দিন হইতে ভারত সমষ্টিগত সাধনা (Collective Sadhana) ভুলিয়া ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে। ফলে কত শত মহাপুরুষ এই দেশে আবির্ভূত হইয়াছেন অথচ তাঁহাদের আবির্ভাব সত্ত্বেও জাতি আজ কিরূপ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে! জাতিকে আবার বাঁচাইতে হইলে সাধনার ধারা আবার অন্য দিকে পরিচালিত করিতে হইবে। জাতিকে বাদ দিয়া ব্যক্তিত্বের সার্থকতা নাই—একথা আজ সকলকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

আমাদের জাতির বহুলোক—পুরুষানুক্রমে বহু জ্ঞান ও সম্পদ আহরণ করিয়া আসিতেছে। এতদিন পর্য্যন্ত সমস্ত জাতি সে জ্ঞান ও সে সম্পদের অধিকারী হইতে পারে নাই। আজ হইতে তাহাকে উহার অধিকারী করিয়া দিতে হইবে। সকলকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, ভারতের প্রতিষ্ঠা আমরা করিতে চাই—সেখানে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের সমান অধিকার, সমান দাবী ও সমান সুযোগ থাকিবে। যে দিন সমস্ত দেশ এ কথা বুঝিবে সে দিন সমস্ত সমাজ মুক্ত হইবার জন্য অধীর ও উন্মত্ত হইবে।

আর একটী কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। জাতির

রক্তস্রোত যেন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে—এখন চাই নূতন রক্ত। ভারতের ইতিহাস পড়িয়া দেখ—বহুবার রক্ত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই রক্ত সংমিশ্রণের ফলে ভারতীয় জাতি বার বার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছে। যাঁহারা বর্ণশঙ্করের ভয় করেন তাঁহারা আমাদের জাতির ইতিহাস জানেন না এবং তাঁহারা মানববিজ্ঞান (anthropology) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আজ অসবর্ণ বিবাহ অনুমোদন করিয়া রক্ত-সংমিশ্রণের সহায়তা করিতে হইবে। এখন এই রক্তসংমিশ্রণ ঘটাইবার জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের দেশে অসবর্ণ বিবাহ বহুকাল নিষিদ্ধ ছিল বলিয়া আমার মনে হয় যে, অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্ত্তনের দ্বারা যথেষ্ট রক্তসংমিশ্রণ ঘটিবে এবং এই রক্ত সংমিশ্রণের ফলে জীবনীশক্তি আমরা ফিরিয়া পাইব।

ভ্রাতৃমণ্ডলী! আজ আমার বক্তব্য এইখানে শেষ করিব। সাম্যবাদ ও স্বাধীনতা মন্ত্র প্রচার করিবার জন্য তোমরা গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়। স্বাধীন ভারতের যে দৃশ্য আজ তোমাদের সম্মুখে ধরিলাম তাহা সমগ্র দেশবাসীর সম্মুখে ধর। স্বাধীনতার পূর্ব্বাস্বাদ নিজের অন্তরে পাইলে সকলেই পাগল হইয়া উঠিবে। এই আস্বাদ—এই অনুভূতি নিজের অন্তরে আগে অবশ্য পাওয়া চাই। নিজের অন্তরে এই আলোক জ্বালো—সেই দীপ হস্তে লইয়াই দেশবাসীর দ্বারস্থ হও। যাও চীনা ছাত্রদের মত—রুষ তরুণদের মত—চাষীর পর্ণকুটীরে ও মজুরদের আবর্জ্জনাপূর্ণ ভগ্ন

গৃহে। তাহাদের জাগাও। আর যাও—মাতৃজাতির সমীপে। যারা শক্তিরূপিনী অথচ সমাজের চাপে আজ যাঁরা হইয়াছেন—"অবলা"—তাঁদেরও জাগাও—বল—

"আপনার মান রাখিতে জননী,
আপনি কৃপাণ ধর।"

সর্ব্বোপরি যাও দলে দলে বাঙ্গলার উপেক্ষিত সমাজের কাছে। বল—"ভাই এতদিন পরে এসেছি তোমাদের কাছে নূতন মন্ত্র নিয়ে তোমাদের মুক্ত করতে—মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার তোমাদেরও প্রাপ্য এই কথা তোমাদের বলতে। তোমরা ওঠো, জাগো—এ বীরভোগ্যা বসুন্ধরা তোমাদেরও ভোগ্যা।"

জিজ্ঞাসা করি—একাজ করতে পারবে? হাঁ পারবে, অবশ্য পারবে। তোমরা পারবে এ কাজ করতে—এ কথা আমি আজ বলতে এসেছি। এগিয়ে চলো—জয়লাভ তোমাদের অবশ্যম্ভাবী। তোমাদের সাধনা সিদ্ধ হউক—ভারত আবার মুক্ত হউক—তোমাদের জীবনও সার্থক হউক।

হুগলী জেলা ছাত্র সম্মেলন—সভাপতির অভিভাষণ; ২১শে জুলাই ১৯২৯

তিন

"আজিকার ছাত্র-আন্দোলন দায়িত্বহীন যুবক-যুবতীর একটা লক্ষ্যহীন অভিযান নহে। দায়িত্বশীল, কর্ম্মক্ষম যে সকল যুবক-যুবতী চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠিত করিয়া দেশের কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করিতে চান, ইহা তাঁহাদের আন্দোলন।

"স্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি সমাজ ও ব্যক্তি, নর ও নারী, ধনী ও দরিদ্র সকলের জন্য স্বাধীনতা। ইহা শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় বন্ধনমুক্তি নহে—ইহা অর্থের সমান বিভাগ, জাতিভেদ ও সামাজিক অবিচারের নিরাকরণ, ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামির বর্জ্জনকেও সূচিত করে। এই আদর্শকে অবিবেচকেরা হয়ত অসম্ভব বলিবে—কিন্তু প্রাণের ক্ষুধাকে একমাত্র ইহাই শান্ত করিতে পারে।...সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ভারতবর্ষের ধ্যানমূর্ত্তিই আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে।... জীবনের একটী মাত্র উদ্দেশ্য আছে—তাহা হইতেছে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি। স্বাধীনতার জন্য উদগ্র আকাঙ্ক্ষাই হইতেছে জীবনের সুর।...জগতের সভ্যতার প্রতি ভারতবর্ষের একটা নব অবদান আছে।... স্বাধীনতাই জীবন—স্বাধীনতার সন্ধানে জীবনদানে আছে অবিনশ্বর গৌরব।"

• •

পঞ্জাব-নিবাসী ভাই-ভগিনীগণ,

পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে আমার এই প্রথম পদার্পণের দিনে আপনারা আমাকে যে সস্নেহ অভিনন্দন করিয়াছেন, তাহার জন্য আমার অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমি যে আপনাদের সম্মান ও অভ্যর্থনার যোগ্য নহি তাহা আমি জানি—তাই আজ আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে, এখানে যে

সৌজন্য ও আতিথেয়তা আমি পাইয়াছি, তাহার কিছু যোগ্যতা যেন অর্জ্জন করিতে পারি।

আপনাদের কাছে আমার মতামত ব্যক্ত করিবার জন্য আপনারা সুদূর কলিকাতা হইতে আমাকে আহ্বান করিয়াছেন। সেই আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়াই আজ আমি আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু বিশেষ করিয়া আমাকেই আপনারা আহ্বান করিয়াছেন কেন? পূর্ব্ব ও পশ্চিম একত্র হইয়া তাহাদের সাধারণ সমস্যার সমাধান করিবে বলিয়াই কি? না, ইংরাজ কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে বিজিত বঙ্গদেশ এবং ইংরাজের সর্ব্বশেষ অধিকার পঞ্চনদ —উভয়েরই উভয়ের সাহায্য চায় বলিয়া? অথবা, আপনাদের ও আমার অন্তরে একই চিন্তা ও একই আশা জাগ্রত রহিয়াছে বলিয়া?

ভারতের এক বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত ছাত্র আমি আজ লাহোরে ছাত্রদিগের মধ্যে বক্তৃতা করিতেছি, এ এক দৈবের কৌতুক! কোথা হইতে নূতন নূতন লোক এবং নব নব ভাব আজ জগতে আদর পাইতেছে বলিয়া প্রবীণেরা যে বর্ত্তমান সময়কে দুঃসময় বলিয়া খেদ করিয়া থাকেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? আমার পূর্ব্ব ইতিহাস জানিয়া যদি আপনারা আমাকে আহ্বান করিয়া থাকেন, তবে আমি আজ কি বলিব, তাহা অনুমান করা আপনাদের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইবে না।

বন্ধুগণ, পঞ্জাব ও বিশেষ ভাবে পঞ্জাবের যুবকগণের প্রতি সশ্রদ্ধ ভাব আমার মনে জাগরূক রহিয়াছে, তাহার উল্লেখ যদি

আজ সর্ব্বপ্রথমেই করি, আশা করি আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। যতীন্দ্রনাথ দাস ও অন্যান্য কারারুদ্ধ বাঙ্গালী দেশ-সেবকের জন্য তাঁহারা যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন—বিচারে পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা, প্রায়োপবেশনে সহানুভূতি, জীবিত ও মৃতাবস্থায় তাঁহাদের প্রতি সুগভীর স্নেহ ও সম্মান—বাঙ্গালীর হৃদয়কে মুগ্ধ করিয়াছে। শুধু তাই নয়, যতীন্দ্রের মৃতদেহ লইয়া বহু পাঞ্জাবী কলিকাতা পর্য্যন্তও গিয়াছেন। ভাবপ্রবণ জাতি আমরা—আপনাদের এই মহানুভবতা আমাদিগের ও আপনাদের মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় সখ্যতা আনিয়া দিয়াছে। ঘোর দুর্দ্দিনে একদিন পাঞ্জাব বাঙ্গালার যে উপকার করিয়াছে, বাঙ্গালী তাহা কখনও বিস্মৃত হইবে না।

যতীন্দ্রের উল্লেখ করিয়া কলিকাতায় একদিন আপনাদের বিশিষ্ট নেতা ডাঃ আলম কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, যতীন্দ্রের জীবন ও মৃত্যু যেন সূর্য্য ও চন্দ্রের বিপরীত গতির মত জীবিতাবস্থায় কলিকাতা হইতে লাহোরে এবং মৃত্যুর পর লাহোর হইতে কলিকাতায়। মৃত্যুহত তাঁহার দেহ একটা নশ্বর মাংসপিণ্ডরূপে কলিকাতায় ফিরিয়া আসে নাই—আসিয়াছিল পবিত্র, মহৎ ও স্বর্গীয় একটা ভাবের প্রতীক হিসাবে। যতীন মরে নাই—ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের পথ নির্দ্দেশ করিবার জন্য সে আকাশের তারকার মত উজ্জ্বল হইয়া জাতির জীবনে বাঁচিয়া আছে, তাঁহার আত্মত্যাগ ও দুঃখের মধ্য দিয়া সে অমর হইয়া আছে। ভাব-মূর্ত্তির মধ্যে, আদর্শের মধ্যে,—মানুষের ইতিহাসে যাহা কিছু

মহৎ, যাহা কিছু পবিত্র,—তাহার মধ্যে সে দীপ্ত ভাস্বর হইয়া বিরাজ করিতেছে। আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়া সে যে শুধু ভারতবর্ষের আত্মাটীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাই নয়, দুইটী প্রদেশকে এক অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে বাঁধিয়া দিয়াছে।

যতই আমরা ক্রমশঃ স্বাধীনতার নবপ্রভাতের দিকে অগ্রসর হইতেছি, ততই আমাদের দুঃখবেদনার পাত্র পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। নিজেদের হাত হইতে রাজশক্তি প্রতিদিন অপসারিত হইতেছে দেখিয়া নির্দ্দয় হইয়া উঠা আমাদের শাসকদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। আর, যদি ক্রমে ক্রমে সভ্যতার ভাণ ত্যাগ করিয়া, মনুষ্যত্বের ছদ্মবেশ ছাড়িয়া তাহারা অত্যাচারের ভীষণ স্বরূপ প্রকাশ করে, তাহাতেও আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। পাঞ্জাব ও বাংলা দেশের উপরে আজকাল সকলের চেয়ে বেশী অত্যাচার করা হইতেছে। বস্তুতঃ, ইহা আনন্দের বিষয়; কারণ, এই অত্যাচারের মধ্য দিয়া আমরা স্বরাজের উপযুক্ত হইয়া উঠিতেছি। ভগৎসিংহ ও বটুকেশ্বর দত্তের মত বীরদের প্রাণশক্তিকে কখনও দমিত করিয়া রাখা যায় না; বরং অত্যাচার ও দুঃখের মধ্য দিয়াই বীরের উদ্ভব হয়। তাই অত্যাচারকে আহ্বান করিয়া আনিতে হইবে এবং তাহার সম্পূর্ণ সুযোগ লইতে হইবে।

আপনারা হয়ত জানেন না, বাঙ্গালা সাহিত্য পাঞ্জাবের প্রাচীন ইতিহাসের কত ঘটনার বর্ণনা করিয়া নিজেকে সমৃদ্ধ করিয়াছে এবং পাঠকদের জ্ঞান বাড়াইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু বিখ্যাত কবিই আপনাদের বীরগণের যশোগাথা গাহিয়াছেন। বাঙ্গালার ঘরে

ঘরে তাঁহারা সুপরিচিত। আপনাদের সাধুসন্তানগণের উপদেশাবলী আমাদের ভাষায় সুপ্রচলিত এবং বাঙ্গালীকেই সান্ত্বনা ও শান্তি দিয়া থাকে। শুধু মানসিক যোগ নয়—রাজনীতির দিক দিয়াও আমরা পরস্পর সংযুক্ত। শুধু ভারতবর্ষের নয়, দূর ব্রহ্মদেশের কারাগারে এবং অন্দামান দ্বীপেও বাঙ্গালার স্বাধীনতা-পথের যাত্রীদের সঙ্গে পাঞ্জাবের যাত্রীদের সাক্ষাৎ হইয়া থাকে।

বন্ধুগণ, যদি এই বক্তৃতায় আমি বহুলভাবে রাজনীতির আলোচনা করি, তাহার জন্য কোন কৈফিয়ৎ আমি দিতে চাহি না। এদেশের এক শ্রেণীর লোক—তাহার মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট লোকও আছেন—মনে করেন যে, বিজিত জাতির পক্ষে রাজনীতি নিরর্থক এবং বিশেষ করিয়া ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদান করা উচিত নহে। আমার নিজের দৃঢ় মত এই যে, বিজিত জাতির পক্ষে রাজনীতির অনুশীলন ছাড়া আর কোনও কর্ত্তব্য নাই। পরাধীন দেশে যে কোন সমস্যার সমাধান করিতে গেলেই দেখা যাইবে তাহার মূলে রহিয়াছে রাজনীতি। দেশবন্ধু বলিতেন, জীবন একটা অখণ্ড সমগ্র সত্তা—কাজেই রাজনীতি ও অর্থনীতির মধ্যে বা এই উভয়ের ও শিক্ষানীতির মধ্যে একটা ভেদরেখা টানা সম্ভব নহে। মানুষের জীবনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখা যায় না। জাতির জীবনের প্রত্যেকটি প্রকাশ পরস্পর সম্বদ্ধ এবং প্রত্যেক সমস্যাই পরস্পর গ্রথিত। ইহা ছাড়া যদি সত্য হয়, তবে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, পরাধীন জাতির সকল অন্যায়, সকল ক্রটীবিচ্যুতির কারণ একটী মাত্র—রাজনৈতিক দাসত্ব। সুতরাং যে সমস্যার

প্রতি ছাত্রেরা কোনক্রমেই উদাসীন হইতে পারে না, তাহা, হইতেছে এই—কেমন করিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করা যাইতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবন।

সকল রকমের জাতীয় কর্ম্মের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী না করিয়া বিশেষভাবে রাজনীতির অনুশীলনকে কেন নিষেধ করা হয়, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। জাতীয় কর্ম্মমাত্রের উপরেই নিষেধাজ্ঞার অর্থ বুঝা যায়, কিন্তু কেবল রাজনীতির সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞার কোনও অর্থই হয় না। পরাধীন দেশের সকল সমস্যাই যদি মূলতঃ রাজনৈতিক হয়, তবে জাতীয় কাজমাত্রেই রাজনৈতিক কাজ। কোনও স্বাধীন দেশেই রাজনীতিতে যোগদান করা নিষিদ্ধ নয়—বরং সেখানে ছাত্রদিগকে এ কাজে উৎসাহই দেওয়া হইয়া থাকে, কারণ, ছাত্রদের মধ্য হইতেই ভবিষ্যতের মনীষী ও রাষ্ট্রবিদ্‌গণের উদ্ভব হয়। ভারতবর্ষের ছাত্রেরা যদি রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে যোগদান না করে, তবে কর্ম্মীই পাওয়া যাইবে কোথা হইতে এবং তাহাদের শিক্ষাই বা হইবে কোথায়? তারপর ইহা দ্বারা যে চরিত্র ও মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। "কর্ম্মবিহীন বিজন সাধনা"-য় কখনও চরিত্রগঠন হয় না, তাই রাজনৈতিক, সামাজিক ও কলাবিষয়ক কাজে নিয়োজিত থাকা অতি আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবলমাত্র গ্রন্থকীট, ভালছেলে ও আপিসের কেরাণী গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিয়া চলা উচিত নহে—তাহাদের উচিত, এমন সব যুবক গড়িয়া তোলা, যাহারা জীবনের সকল দিকেই দেশের জন্য সম্মান অর্জ্জন করিয়া যশস্বী হইবে।

বর্ত্তমান কালের একটা সুলক্ষণ দেখিতে পাইতেছি এই যে, ভারতবর্ষের সকল স্থানেই একটা সত্যকার ছাত্র-আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। এই আন্দোলনকে আমি ব্যাপকতর যৌবন-আন্দোলনের একটি অংশ বলিয়া মনে করি। কারণ আজকালকার ছাত্র সম্মিলনী এবং দশ বৎসর পূর্ব্বের ছাত্র-সম্মিলনীর মধ্যে প্রচুর প্রভেদ আছে। সে সময়কার ছাত্র-সম্মিলনগুলি সাধারণতঃ সরকারের উদ্যোগেই অনুষ্ঠিত হইত এবং তাহার প্রবেশদ্বারেই লিখিত থাকিত—"রাজনীতি সম্বন্ধে কথা বলা নিষিদ্ধ।" একদিক দিয়া, সেই সকল সম্মিলনীর পূর্ব্বকালের কংগ্রেসের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যাইতে পারে—সেখানে প্রথম প্রস্তাবেই রাজার প্রতি বাধ্যতা জানান হইত। ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসে ও ছাত্র আন্দোলনে উভয় ক্ষেত্রেই আমরা সে অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। আজ আমাদের চিন্তা ও আলোচনার পথ অনেক বেশী মুক্ত হইয়া গিয়াছে।

আজিকার ছাত্র আন্দোলন দায়িত্বহীন যুবক-যুবতীর একটা লক্ষ্যহীন অভিযান নহে। দায়িত্বশীল, কর্ম্মক্ষম যে-সকল যুবক-যুবতী চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সুগঠিত করিয়া দেশের কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করিতে চান. ইহা তাঁহাদের আন্দোলন। ইহার দুইটী কর্ম্মধারা আছে অথবা থাকা উচিত। প্রথমতঃ, যে-সব সমস্যা বিশেষভাবে ছাত্রদিগের নিজস্ব, তাহার সমাধানের চেষ্টা করা এবং শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক দিক্ দিয়া একটা নবজীবন আনয়ন করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রেরা ভবিষ্যতের দেশবাসী একথা স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে জীবনের সংগ্রামক্ষেত্রের

জন্য উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা এবং সংসারে যে সকল সমস্যা ও বিরুদ্ধশক্তির সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহার পূর্ব্বাভাষ এখন হইতেই তাহাদিগকে দেওয়া প্রয়োজন।

আজকালকার যৌবন-আন্দোলনের বিশেষত্ব হইতেছে—একটা চঞ্চলতার ভাব, বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি একটা অসহিষ্ণুতা এবং নূতনতর ও উৎকৃষ্টতর মানব-সমাজ স্থাপনা করিবার জন্য প্রবল আকাঙ্খা। দায়িত্বজ্ঞান ও আত্মনির্ভরের ভাব এই আন্দোলনের মূলনিহিত। যৌবন আজ আর প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের ঘাড়ে সকল ভার চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে চায় না। তাহারা মনে-প্রাণে অনুভব করে যে দেশ এবং দেশের ভবিষ্যৎ তাহাদের উপরেই নির্ভর করে, তাই সে দায়িত্বটীকে তাহারা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করে এবং তাহা রক্ষা করিবার উপযোগী হইবার সাধনা করে। যৌবন-আন্দোলনের অংশীভূত এই ছাত্র-আন্দোলন এক ভাব ও আদর্শের দ্বারাই অনুপ্রাণিত।

যে দুইটী কর্ম্মধারার নির্দ্দেশ আমি করিয়াছি, তাহার প্রথমটী হয়ত সাধারণভাবে কর্ত্তৃপক্ষের ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে পড়িতে না পারে, কিন্তু অপরটী নিষিদ্ধ হইবারই সম্ভাবনা বেশী। প্রথমটীর দিক দিয়া আপনারা কি করিবেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিতে যাওয়া আমার পক্ষে উচিত বা বাঞ্ছনীয় হইবে না। আপনাদের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন ও সে সকল পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষা-কর্ত্তারা কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার উপর ইহা নির্ভর করে। প্রত্যেক ছাত্রেরই বল ও স্বাস্থ্য, উন্নত চরিত্র, জ্ঞানবত্তা এবং উচ্চ

শক্তিসম্পন্ন আদর্শ থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। যদি শিক্ষা-কর্ত্তাদের ব্যবস্থায় এই সকল প্রয়োজন সিদ্ধ না হয়, তবে আপনাদিগকেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে। ইহাতে যদি তাঁহাদের ও গুরুজনদের উৎসাহ পান, তবে তো সে ভালই; যদি তাঁহারা প্রতিকূলাচরণ করেন—তবে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া আপনার পথে অগ্রসর হউন। আপনাদের জীবন আপনাদেরই—এবং তাহার উৎকর্ষের দায়িত্ব ও শেষ পর্য্যন্ত আপনাদেরই।

এই সম্পর্কে একটী কথা আমি বলিতে চাই। আমার মনে হয়, ছাত্রসংঘগুলি এক একটী যৌথ স্বদেশী ভাণ্ডার (Co-operative Swadeshi Store) খুলিয়া ছাত্রদের বহু উপকার করিতে পারেন। ছাত্রেরা যদি সুচারুভাবে এই সকল ভাণ্ডার চালাইতে পারেন, তাহা হইলে দুইটি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। একদিকে ছাত্রেরা অল্প মূল্যে স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করিতে পারিবে এবং বহু গৃহ-শিল্পের উৎসাহ বর্দ্ধন করা হইবে। অপর দিকে, যৌথ কারবার চালাইবার অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া লভ্যাংশ ছাত্র-সমাজের কল্যাণে ব্যয় করা যাইবে।

ছাত্রদের কল্যাণের জন্য ব্যায়াম সমিতি, ব্যায়ামাগার, পাঠচক্র, আলোচনা-সমিতি, মাসিক পত্র পরিচালনা, সঙ্গীত সমাজ, পাঠাগার, সমাজকল্যাণ-সংঘ ইত্যাদি স্থাপনা করিতে হইবে।

অপর দিক্‌টী সম্ভবতঃ ইহার চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। সে হইতেছে ভবিষ্যতের দেশবাসী হইবার শিক্ষা গ্রহণ। এই শিক্ষা চিন্তা ও কার্য্য উভয় দিক্ দিয়াই হইবে। ছাত্রদিগের চক্ষের

সম্মুখে এমন একটি আদর্শ নরসমাজের চিত্র ধরিতে হইবে, যাহাতে তাহারা ঐ আদর্শকে জীবনে বাস্তবে পরিণত করিতে চেষ্টা করে এবং এই সঙ্গে এমন একটী কর্ম্ম তালিকা তাহাদিগকে দিতে হইবে, যাহাকে তাহারা যতদূর সম্ভব পালন করিবে। এই কর্ম্মে তাহারা হয়ত কর্ত্তাদের নিকটে অনেক বাধা পাইবে। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিরোধ ঘটে, তবে ছাত্রদের পক্ষে নির্ভীক ও আত্মনির্ভরশীল হইয়া চিন্তায় ও কর্ম্মে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া আর উপায় নাই।

যে আদর্শকে আমরা সযত্নে পোষণ করিব, তাহার সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আমি একটী কথা বলিতে চাই। ইউরোপের পদানত শৃঙ্খলিত এশিয়ার অবস্থা প্রত্যেক এশিয়াবাসীরই মনে দুঃখ ও অপমান বহিয়া আনে। কিন্তু একথা ভাবিলে ভুল করা হইবে যে, এশিয়ার অবস্থা চিরদিনই এরূপ ছিল। ইতিহাসের সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন কালে এশিয়া ইউরোপের বহু অংশ জয় করিয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। সে দিন ইউরোপ এশিয়ার নামে ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিত। সে অবস্থার আজ পরিবর্ত্তন হয়ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে নিরাশার কারণ কিছুই নাই। আজ এশিয়া তাহার দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচনের উদ্যোগ করিতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে একদিন শক্তি ও গৌরবে ভাস্বর হইয়া স্বাধীন জাতি সমূহের মধ্যে তাহার নির্দ্দিষ্টস্থানে আসন গ্রহণ করিবে।

পাশ্চাত্যের বাস্তবাগীশগণ কখনও কখনও এই প্রাচীন প্রাচ্যকে

"অপরিবর্ত্তনশীল" বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে—যেমন কিছুদিন পূর্ব্বেও তাহারা তুরস্ককে 'ইউরোপের অসুস্থ জাতি" বলিয়া অভিহিত করিত। কিন্তু এই নিন্দা এসিয়া বা তুরস্ক কাহারও পক্ষে সত্য নয়। সমস্ত প্রাচ্যদেশ আজ নব জাগরণের বিপুল শক্তিতে টলমল। সর্ব্বত্রই পরিবর্ত্তন, উন্নতি এবং সমাজব্যবস্থার সঙ্গে বিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছে। যতদিন ইচ্ছা প্রাচ্য অবশ্য অপরিবর্ত্তনশীল থাকিতে পারে, কিন্তু একবার পরিবর্ত্তন আরম্ভ করিলে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের বহু সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে। আজ এসিয়ায় তাহাই ঘটিতেছে।

মাঝে মাঝে কেহ প্রশ্ন করেন—আজ এসিয়া, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে যে চাঞ্চল্য দেখিতেছি, তাহা কি সত্য সত্যই জীবনের চিহ্ন, না বাহিরের উত্তেজনার একটা প্রক্রিয়া মাত্র? আমি মনে করি, নব নব সৃষ্টিই জীবনের লক্ষণ। যখন দেখিতে পাই যে, বর্ত্তমান আন্দোলন একটা নূতন পথ কাটিয়া নব নব সৃষ্টির উদ্যমপূর্ণ বেগে চলিতেছে, তখনই বুঝিতে পারি যে, সত্য সত্যই জাতির নবজাগরণ আসিয়াছে, এবং ইহা সত্য সত্যই অন্তরের মধ্য দিয়া পুনঃ চেতনার গভীর আলোড়ন।

ভারতবর্ষে আজ আমরা একটা ভাবধারায় ঘূর্ণাবর্ত্তের মাঝখানে রহিয়াছি। তাহার চারিদিক দিয়া বহু অনুকূল ও প্রতিকূল স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। এই তুমুল মিশ্রণের অব্যবস্থার মধ্যে সাধারণ লোক ভালমন্দ ন্যায় অন্যায়ের মধ্যে প্রভেদ করিতে পারে না। কিন্তু আজ যদি আমাদিগকে জাতির লুপ্ত শক্তিকে ফিরাইয়া

আনিয়া তাহাকে লক্ষ্যপথে চালাইতে হয়, তবে আমাদের লক্ষ্য কি এবং কেমন করিয়া সে লক্ষ্যে পৌঁছান যায়, তাহার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিতে হইবে।

একটা তিমির-যুগ পার হইয়া ভারতবর্ষের সভ্যতা আজ নব-জীবনের পথে চলিয়াছে। ফিনিসীয়া ও ব্যাবিলনের সভ্যতার মত এই সভ্যতা স্বাভাবিকভাবে বিলুপ্ত হইবে কি না, একদিন সেই ভাবনা ছিল, কিন্তু আবার তাহা কালের অত্যাচার কাটাইয়া উঠিয়াছে। আবার নূতন করিয়া বাঁচিতে হইলে আমাদিগকে চিন্তাজগতে একটা ভাব-বিপ্লব আনিতে হইবে এবং জীবজগতে নব-রক্তের সংমিশ্রণ করিতে হইবে। ইতিহাসের এবং মনীষি-গণের মত মানিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে এই এক উপায়েই প্রাচীন জীর্ণ সমাজকে শক্তিমান্ করিয়া তোলা সম্ভব। আমার কথায় বিশ্বাস না হইলে আপনারা সভ্যতার উত্থান-পতনের নিয়মটী নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করুন। এই নিয়মটী আবিষ্কার করিতে পারিলেই আমরা দেশবাসীকে পরামর্শ দিতে পারিব, উন্নতিশীল, শক্তিধর জাতি সৃষ্টি করিতে হইলে কি পথ অবলম্বন করিতে হইবে।

ভাবজগতে বিপ্লব আনিতে হইলে আমাদিগকে এমন একটী আদর্শকে চোখের সম্মুখে আনিয়া ধরিতে হইবে, যাহা বিদ্যুতের মত আমাদের শক্তিকে উন্মুখ করিয়া তুলিবে। সে আদর্শ হইতেছে স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ সকলে এক বুঝেন না; আমাদের দেশেও স্বাধীনতার অর্থের একটা ক্রম পরিবর্ত্তন

হইতেছে। স্বাধীনতা বলিতে আমি বুঝি সমাজ ও ব্যক্তি, নর ও নারী, ধনী ও দরিদ্র সকলের জন্য স্বাধীনতা, শুধু ইহা রাষ্ট্রীয় বন্ধন-মুক্তি নহে, ইহা অর্থের সমানবিভাগ, জাতিভেদ ও সামাজিক অবিচারের নিরাকরণ ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি বর্জ্জনও সূচিত করে। এই আদর্শকে অবিবেচকেরা হয়ত অসম্ভব বলিবে —কিন্তু প্রাণের ক্ষুধাকে একমাত্র ইহাই শান্ত করিতে পারিবে।

জাতীয় জীবনের যত দিক দিয়া প্রকাশ হইতে পারে স্বাধীনতার আংশিক রূপ ততগুলিই। কেহ কেহ স্বাধীনতা বলিতে স্বাধীনতার একটি বিশেষ দিকের কথাই বুঝেন। স্বাধীনতার এই সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞাটীকে কাটাইয়া উঠিয়া ব্যাপক অর্থটী গ্রহণ করিতে আমাদের বহু বৎসর লাগিয়াছে। যদি স্বার্থের মুখ না চাহিয়া স্বাধীনতার জন্যই স্বাধীনতাকে আমরা ভালবাসিতে চাই, তাহা হইলে একথা বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে, সত্যকার স্বাধীনতার অর্থ কেবল মাত্র ব্যক্তির জন্য নয়, সমগ্র সমাজের জন্যও সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি। এযুগের আদর্শ তাহাই—সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত ভারতবর্ষের ধ্যানমূর্ত্তিই আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। স্বাধীনতা অর্জ্জনের একমাত্র উপায় হইতেছে স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায় চিন্তা অনুভব করা। অন্তরে একটা পূর্ণ বিপ্লবের বন্যা বহিয়া যাউক এবং স্বাধীনতার মদিরপ্রবাহ আমাদের শিরায় শিরায় বহিয়া যাউক। স্বাধীন হইবার ইচ্ছা যখন আমাদের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিবে তখন কর্ম্মের একটা অশ্রান্ত প্রবাহ আমাদের হৃদয়ে যাইবে। ভীরুর সাবধান বাণী তখন আমাদিগকে নিবৃত্ত

করিতে পারিবে না—সত্য ও কর্ম্মের আহ্বান আমাদিগকে তখন লক্ষ্যে পৌঁছিয়া দিবে।

বন্ধুগণ, জীবনের লক্ষ্য হিসাবে আমি যাহা চিন্তা ও অনুভব করি এবং যাহা আমার সকল কর্ম্মের পশ্চাতে ইঙ্গিত স্বরূপ রহিয়াছে, সেই আদর্শের কথা আপনাদিগকে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। আপনাদিগের মনে ইহা ভাল লাগিবে কি না তাহা আমি জানি না কিন্তু আমি জানি যে, জীবনের একটীমাত্র উদ্দেশ্য আছে, তাহা হইতেছে সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত। স্বাধীনতার জন্য উদগ্র আকাঙ্ক্ষাই হইতেছে জীবনের মূল সুর—সদ্যোজাত শিশুর প্রথম ক্রন্দন ধ্বনিই তো বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা। আপনাদের নিজেদের প্রাণে এবং দেশবাসীব প্রাণে স্বাধীনতার এই তীব্র আকাঙ্ক্ষাটী জাগাইয়া তুলুন—তাহা হইলে ভারতবর্ষ অল্পদিনের মধ্যেই স্বাধীনতা লাভ করিবে।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবেই, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। রাত্রির পর দিন যেমন আসিবেই, তেমনি ইহাও আসিবে। ভারতবর্ষকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে, এমন কোনও শক্তি এ পৃথিবীতে আজ নাই। কিন্তু আসুন, এমন মহিয়সী ভারতের ধ্যানচিত্র আজ আমরা গড়িয়া তুলি, যাহার জন্য জীবন-সর্ব্বস্বধন বলি দিয়া আমরা ধন্য হইতে পারি। আমি ভারতবর্ষের যে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছি, তাহা আপনাদিগকে বলিয়াছি। স্বাধীন ভারতবর্ষ তাহার মুক্তিবাণী জগতের কাছে দিকে দিকে ঘোষণা করুক।

আমি বলিতে চাই, ভারতবর্ষের একটা বিশেষ বাণী আছে

এবং জগতকে তাহা শুনাইবার জন্যই ভারতবর্ষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাঁচিয়া আছে। জগতের সাধনা ও সভ্যতার প্রায় প্রতি রূপেই ভারতবর্ষের একটা নব অবদান দিবার আছে। এই হীনতা ও পরাধীনতার মধ্যেও তাহার দান বড় নগণ্য নয়। আপনার প্রয়োজন মত আপনার পথে চলিবার স্বাধীনতা পাইলে সে-দান কত বৃহৎ ও মূল্যবান হইবে, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।

দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও হয়ত স্বাধীনতার এই বিস্তৃত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবেন না। তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে অসামর্থ্য অবশ্যই দুঃখের বিষয়; কিন্তু সত্য, ন্যায় ও সাম্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত এই আদর্শকে আমরা এখনই ত্যাগ করিতে পারি না। অপর কেহ আমাদিগের সঙ্গে যদি যোগ না দেয় তবে আমাদিগকে একাই চলিতে হইবে—কিন্তু একথা নিশ্চিত যে লক্ষ লক্ষ লোক এই স্বাধীনতার পথে যাত্রায় যোগ দিবে। বন্ধন, অন্যায় ও অসাম্যের সঙ্গে যুদ্ধের বিরতি হইতেই পারে না।

দেশের সকল স্বাধীনতাকামীরই সংঘবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতার সৈনিক শ্রেণী গঠন করিবার সময় আসিয়াছে।

ইহারা কেবলমাত্র স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দিবে না—স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিবার জন্যও দিকে দিকে প্রচারক প্রেরণ করিবে। আপনাদের মধ্য হইতেই এই প্রচারক ও সৈন্য দলের সৃষ্টি করিতে হইবে। বিস্তৃত ও অন্তর্ব্যাপী (intensive) প্রচার ও দেশব্যাপী স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন আমাদের কর্ম্ম তালিকার

অন্তর্ভুক্ত হইবে আমাদের প্রচারকগণ চাষী ও কারখানার মজুরদের মধ্যে গিয়া নব বাণীর প্রচার করিবে। তাহারা যুবকদের এবং তাহাদের সংঘগুলিকে অনুপ্রাণিত করিবে। পরিশেষে তাহারা দেশের সমগ্র নারীজাতিকে উদ্বুদ্ধ করিবে—কারণ, আজ নারীকে সমাজে ও রাষ্ট্রে পুরুষের সমান অধিকার লইয়া দাঁড়াইতে হইবে।

বন্ধুগণ, আপনাদের মধ্যে অনেকেই এখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দলভুক্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। জাতীয় কংগ্রেসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। জাতির সকল আশা ভরসা ইহার উপর ন্যস্ত। কিন্তু শক্তি ও প্রতিষ্ঠার জন্য ইহার শ্রমিক আন্দোলন, যৌবন আন্দোলন, চাষী আন্দোলন, নারী আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন উপরে নির্ভর করিতে হয় এবং আমার মতে, করা উচিত। যদি আমরা শ্রমিক, চাষী, তথা কথিত নিম্নজাতি, যুবকবৃন্দ, ছাত্রগণ ও নারীদিগকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারি, তবে কংগ্রেস অসীম শক্তিমান হইয়া দেশের মুক্তি আনয়ন করিতে পারিবে। সুতরাং, যদি আপনারা সার্থকভাবে কংগ্রেসের সেবা করিতে চাহেন, তাহা হইলে এই সকল আন্দোলনকেও আপনাদের জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

আমাদের ঘরের পাশেই চীনদেশ—তাহার ইতিহাসের একটী যুগ পর্যবেক্ষণ করুন—দেখিতে পাইবেন মাতৃভূমির জন্য চীনের ছাত্রেরা কি করিয়াছেন। ভারতবর্ষের জন্য আমরা কি সেটুকু করিতে পারি না? আধুনিক চীনের নবজাগরণ তো ছাত্র ও

ছাত্রীদের জন্যই সম্ভবপর হইয়াছে। একদিকে তাহারা গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে কারখানায় গিয়া স্বাধীনতার নূতন বাণী প্রচার করিয়াছেন, অপর দিকে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দেশকে তাহারা সংঘবদ্ধ করিয়াছে। ভারতবর্ষে আমাদেরও তাহাই করিতে হইবে। স্বাধীনতার কোনও সহজ নির্ব্বিঘ্ন পথ নাই স্বাধীনতার পথে যেমন আঘাত-বিপদ আছে, তেমনি গৌরব ও অমরত্ব আছে। প্রাচীনের যাহা কিছু শৃঙ্খলের মত আমাদের চলাকে প্রতিপদে প্রতিহত করিয়া আসিতেছে, আজ তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তীর্থযাত্রীর মত দলে দলে স্বাধীনতার লক্ষ্যপথে যাত্রা করিতে হইবে। স্বাধীনতাই জীবন, স্বাধীনতার সন্ধানে জীবনদানে অবিনশ্বর গৌরব। আসুন আজ আমরা সম্মিলিত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করি—সেই উদ্দমে জীবনপাত করিয়া আমরা মৃত্যুঞ্জয়ী যতীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসী হইবার উপযুক্ত হই। বন্দেমাতরম্।

(বিগত ১৯শে অকটোবর ১৯২৯ লাহোরে পাঞ্জাব ছাত্র সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ। ইংরাজী হইতে অনূদিত।)

চার

"এই জরাজীর্ণ দেশের যৌবন ফিরাইয়া আনিতে হইলে—সমগ্র ভারতে একটি জাতিগঠন করিতে হইবে, ভাল ও মন্দ সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা এতদিন বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।"

মধ্য প্রদেশ এবং বেরারের ছাত্রগণের এই সম্মিলনে যোগদান করিতে সমর্থ হইয়াছি বলিয়া আজ আমি মনে মনে পরম আনন্দ উপভোগ করিতেছি। ইহা কেবল আনন্দের বিষয় নহে, এরূপ ছাত্র সম্মিলনে যোগদান করিতে পারা আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য —ইহাও বলিতে হইবে। আপনাদের মনস্তুষ্টির জন্যই আমি একথা বলিতেছি না—ইহা বাস্তবিকই আমার মনের কথা। ইহাতে একটুও অতিরঞ্জন নাই। কারণ, প্রকৃত পক্ষে ছাত্রদের সংস্পর্শে আসিলেই যেন আমার চিত্তবৃত্তির স্বতঃ বিকাশ হয়, সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ কাটিয়া যায় এবং আমি আমার প্রাণের কথা অকপটে ব্যক্ত করিতে পারি।

বিশ্ব-বিদ্যালয় ছাড়িয়া বাহির হইবার পর প্রায় দশ বৎসর আমার কাটিয়া গিয়াছে। এখনও কিন্তু আমি নিজেকে ছাত্র ছাড়া আর কিছুই মনে করিতে পারি না। তবে আমার এই বিশ্ব-বিদ্যালয় আপনাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে একটু বড় এবং ব্যাপক।

ইহাকে "জীবনের বিশ্ব-বিদ্যালয়" বলিলেই ঠিক হয়। আমি এখন জীবন সংগ্রামে ব্যাপৃত, নিত্য নূতন উপদেশ এবং অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করাই আমার বর্ত্তমান কাজ। তথাপি আমার মনে হয়, ছাত্র জীবনের আদর্শবাদ, কল্পনা ও ভাবুকতা একেবারে আমাকে ছাড়িয়া যায় নাই। সুতরাং আমার পক্ষে আপনাদের অভাব অভিযোগ, সুখ দুঃখ এবং আশা আকাঙ্ক্ষার কথা উপলব্ধি করা বোধ হয় একান্ত অসম্ভব হইবে না।

তথাপি আমার একটা সন্দেহ আছে—তাহা এই যে, ছাত্র সম্মিলনের সভাপতি হইবার যোগ্যতা আদৌ আমার আছে কিনা? কারণ, ছাত্র জীবনের "সচ্চরিত্রতার" দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হয়, আমার নিজের ছাত্র জীবন নিষ্কলঙ্ক ছিল না। এখনও সেদিনের কথা আমার স্পষ্টই মনে হইতেছে, যেদিন প্রিন্সিপাল সাহেব আমাকে ডাকাইয়া নিয়া আমার উপর দণ্ডাদেশ জারী করিয়াছিলেন, কলেজ হইতে আমাকে সস্‌পেণ্ড করিয়াছিলেন। তাঁহার কথাগুলি এখনও আমার কাণে বাজিতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন—"কলেজের মধ্যে তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা দুরন্ত ছেলে।"

আমার জীবনের সেইটি একটি স্মরণীয় দিন। বলিতে গেলে, নানা দিক দিয়াই সেদিন হইতে আমার জীবনের সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইয়াছিল। সে দিন-ই আমি সর্ব্ব প্রথম অনুভব করিলাম—কোনও মহৎ উদ্দেশ্যে নির্য্যাতন সহ্য করার মধ্যে একটা বিমল আনন্দ আছে। এই আনন্দের সহিত জীবনের আর

কোন আমোদ প্রমোদেরই তুলনা হয় না। আর সমস্তই ইহার নিকট তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ। ইতিপূর্ব্বেই আমি আদর্শের মধ্য দিয়া নীতিজ্ঞান ও স্বদেশিকতার পরিচয় পাইয়াছিলাম; কিন্তু সেই দিনই সর্ব্বপ্রথম এই সমস্তের পরীক্ষা—শুধু পরীক্ষা নয়, অগ্নি পরীক্ষা হইয়া গেল। এই গুরুতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমি দেখিলাম—আমার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি ও কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া গিয়াছে।

বন্ধুগণ, আপনারা হয়ত মনে করিতেছেন যে, এই লোকটা বড়ই অদ্ভুত। কোথায় আমাদের কথা আলোচনা করিবে,—না তাহার পরিবর্ত্তে সে নিজের কথাই আলোচনা করিতে লাগিল! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমি এখানে কেন আসিয়াছি? আমার উদ্দেশ্য কি, তাহা আপনারা স্থির করিয়াছেন কি? নীতিজ্ঞান ও স্বাদেশিকতা সম্পর্কে লম্বা বক্তৃতা করিতে আমি এখানে আসি নাই; আমি আসিয়াছি আমার নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ কয়েকটি জ্ঞানের কথা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে। একথা কি সত্য নহে যে, কেবল সেই উপদেশেরই মূল্য আছে, যে উপদেশ প্রকৃত পক্ষে নির্য্যাতন ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে সংগৃহীত হইয়াছে?

ভারতের সর্ব্বত্র আজ তোলপাড় আরম্ভ হইয়াছে। বিভিন্ন ভাব ও আদর্শের সংঘাত বাধিয়াছে। বহুসংখ্যক আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সংস্কারমূলক—বর্ত্তমান অবস্থার সংস্কার সাধনই তাহাদের লক্ষ্য। অপর কতকগুলি হইতেছে নির্ম্মূলকারী—বর্ত্তমান অবস্থার অবসান করিয়া

নূতনের জন্মদান করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। এই সমস্ত হট্টগোলের মধ্যেই আজ নূতন ভারতের জন্ম হইতেছে। এ সময়ে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দিয়া ভাবী উন্নতি-অবনতির গতি নিয়ন্ত্রণ ও নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। যাহারা তরুণ, যাহাদের আদর্শ অতি মহান্ এবং অতিশয় উচ্চ, যাহাদের আত্মসম্বিৎ অতি প্রখর, সমগ্র জাতির ভাবধারার সহিত যাহারা নিজের ভাবধারা মিলাইয়া দিতে সমর্থ, যাহাদের ইতিহাস শিক্ষা ও উপদেশ লাভ সম্পূর্ণ হইয়াছে— কেবল তাহারাই এ কাজের উপযুক্ত। কেবল তাহারাই এ সময়ে ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ নির্দ্দেশ করিতে পারে।

ভারতে এখন যে সমস্ত আন্দোলন দেখা দিয়াছে তাহাদের কথা একে একে বিশ্লেষণ করিতে হইলে এবং প্রত্যেকটির বিষয়ে আমার নিজের মতামত প্রকাশ করিতে হইলে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন,—এক দিনের বক্তৃতায় তাহা শেষ হইবে না। আমি তাই আজ সে চেষ্টা করিব না। তবে একটি কথা আমি বিশেষ জোর দিয়া বলিতে চাই,—তাহা এই যে, এই জরাজীর্ণ দেশের যৌবন ফিরাইয়া আনিতে হইলে—সমগ্র ভারতে একটি জাতি গঠন করিতে হইলে ভাল ও মন্দ সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা এতদিনে বদ্ধমূল হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। দার্শনিকের ভাষায় বলিতে গেলে, সামাজিকতা ও নৈতিকতার মাপ কাঠিতে যে জিনিষের যে মূল্য আমরা এখন দিয়া থাকি আবার নূতন করিয়া নূতনভাবে তাহার মূল নিরূপণ করিতে হইবে।

বিশেষ অভিনিবেশের দরকার নাই—দূর হইতে সাধারণভাবে লক্ষ্য করিলেও একটা কথা ধরা পড়ে। তাহা এই যে, বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ আন্দোলনই তেমন দূর-প্রসারী নহে; এগুলির প্রায় প্রত্যেকটি একান্ত অগভীর। ইহারা সমগ্র জাতির অন্তরে সাড়া জাগাইতে পারে নাই,—কেবল আমাদের সমাজ ও জাতির বাহ্যিক অভাব অভিযোগের এক আধটু স্পর্শ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছে। এ সমস্ত আন্দোলন দ্বারা যে কোন কাজই হয় না বা হইতে পারে না—একথা বলিতেছি না। ইহাদের দ্বারা খুব সামান্য কাজই হইতে পারে। মোটের উপর সমগ্র জাতিকে জাগ্রত করিতে হইলে এরূপ অগভীর আন্দোলন দ্বারা বিশেষ কোন কাজ হইবে না, হইতে পারে না। আমরা চাই—জাতীয় জাগরণ, বাহ্যিক নহে—আন্তরিক জাগরণ। সমগ্র জাতির প্রাণে সাড়া জাগাইতে হইবে। অত্যল্প সময়ের মধ্যে তাহা কিরূপে সম্ভব পর—ইহাই আমাদের প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান চাই।

আমাদের এই দেশ বড়ই প্রাচীন। আমাদের এই সভ্যতাও খুবই পুরাতন; তথাপি ইহার আভ্যন্তরীন শক্তি ও বেগ একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। জাতি হিসাবে আমরা বীরের মত অনেক ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়াছি। সময় সময় ইহাতে অভিভূত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিলেও আজ পর্য্যন্ত আমরা জাতি হিসাবে একেবারে নির্ম্মূল হই নাই। কখনও যদি আমরা শ্রান্ত, ক্লান্ত এবং অবসন্ন হইয়া থাকি তবে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোনই কারণ

নাই। কারণ জীবন রক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে নিদ্রা ও বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়া থাকে। আজ আমরা অবসন্ন ও দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেও জাতি হিসাবে আমাদের মৃত্যু হয় নাই। চিন্তায় ও কার্য্যে মৌলিকতা এবং সৃজনী শক্তিই জীবনের লক্ষণ। এই সমস্ত বিষয়ে জাতি হিসাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে গৌরব করিবার যথেষ্ট অধিকার আমাদের আছে। আমরা যদি বাঁচিয়া না থাকিতাম তাহা হইলে জাতীয় জাগরণের সমস্ত আশাই বিফল হইত। আমরা এখনও জীবিত আছি এবং জাতি গঠনের সমস্ত উপাদানই আমাদের রহিয়াছে। সেইজন্যই আজও আমরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতেছি।

অন্তরের দিক হইতে যে জাগরণ—সেই জাগরণই আমরা চাই। কেবল তাহাতেই আমাদের এই জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইতে পারে। এখানে সেখানে এক আধটু সংস্কার দ্বারা কাজ হইবে না, বাহ্যিক প্রলেপ কার্য্যকরী হইবে না। সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সম্পুর্ণ নূতন জীবন পরিগ্রহণই আমাদের বর্ত্তমানের প্রয়োজন। ইহাকে ইচ্ছা করিলে "সম্পূর্ণ বিপ্লব" আখ্যাও দেওয়া যাইতে পারে।

"বিপ্লব" এই কথাটি শুনিয়া আপনারা চমকিত হইবেন না। বিপ্লবের ধারা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে মতভেদ হইতে পারে। তবে এ পর্য্যন্ত আমি এমন লোক একটিও দেখি নাই—যে কখনও বিপ্লবের কথায় বিশ্বাস করে না! মোটের উপর বিবর্ত্তন (**Evolution**) এবং বিপ্লব (Revolution) এই দুইয়ের মধ্যে

কোন মজ্জাগত প্রভেদ নাই। অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে যে বিবর্ত্তন (Evolution) সম্পন্ন হয় তাহাই বিপ্লব (Revolution); পক্ষান্তরে দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া যে বিপ্লব সম্পন্ন হয় তাহাই বিবর্ত্তন। বিবর্ত্তন ও বিপ্লব এই উভয়েরই গোড়ার কথা হইল পরিবর্ত্তন। এই জগতে উভয়েরই স্থান আছে। প্রকৃতপক্ষে বিপ্লব ও বিবর্ত্তনের মধ্যে কোনটিকেই একেবারে বাদ দিয়া চলা যায় না।

আমি বলিয়াছি যে, ভালমন্দ সম্পর্কে এখনও আমাদের যে সমস্ত ধারণা আছে তাহার অনেকগুলিই পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। আমি ইহাও বলিয়াছি যে, আমাদের বর্ত্তমান গতানুগতিক জীবনের একটা আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। জাতি হিসাবে বড় হইতে হইলে এবং জগতের সভ্য জাতিসমূহের মধ্যে গৌরবের আসন অধিকার করিতে হইলে ইহাই আমাদের একমাত্র পথ। সেই জীবনেরই একমাত্র সার্থকতা আছে, মূল্য আছে এবং অর্থ আছে—যে জীবনের সম্মুখে একটা বৃহত্তর ও মহত্তর আদর্শ রহিয়াছে। যে জাতি উন্নতি করিতে চায় না, বিশ্বসভায় বিশেষত্ব লাভ করিতে চায় না, সে জাতির পক্ষে বাঁচিবার কোনই প্রয়োজন নাই—এমন কি বাঁচিবার কোন অধিকারই তাহার নাই। আমি এ কথা বলি না যে, কোনও স্বার্থগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই এক একটা জাতির পক্ষে উন্নতির চেষ্টা করা দরকার। সমগ্র মানব সমাজকে উদার ও মহৎ করিয়া তুলিবার জন্যই প্রত্যেক জাতিকে উন্নত হইতে হইবে। যাহাতে পরিশেষে এই বিশ্বজগৎ মানব

জাতির বসবাসের পক্ষে অধিকতর সুখকর কল্যাণকর হয় তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে।

একটা জাতিকে উন্নতিশীল করিতে হইলে যে সমস্ত উপাদানের প্রয়োজন হয় তৎসমস্ত উপাদানই ভারতের আছে। কি জাগতিক, কি আধ্যাত্মিক, কি নৈতিক কোনও রূপ উপাদানেরই অভাব এখানে নাই। ভারতবর্ষ যে কত প্রাচীন তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই; তথাপি সে মরে নাই; এখনও ভারতবর্ষ জীবিত আছে। কেন সে বাঁচিয়া আছে? তাহাকে আবার মহান হইতে হইবে, আবার তাহাকে উন্নত হইতে হইবে। জগতকে মহত্তর ও বৃহত্তর কিছু দান করিবার জন্যই ভারতবর্ষ আজও বাঁচিয়া আছে।

ভারতের লক্ষ্য কি? তাহার কর্ত্তব্য কি? প্রথমতঃ নিজকে বাঁচাইতে হইবে এবং তারপর জগতের সভ্যতার ভাণ্ডারে কিছু-না-কিছু দান করিতে হইবে। অর্দ্ধ শতাধিক অসুবিধার মধ্যে থাকিয়াও ভারতবর্ষ আজ যাহা দিয়াছে তাহা নিতান্ত তুচ্ছ নহে। এখন একবার কল্পনা করুন দেখি, ভারতবর্ষ যদি তাহার নিজ অভিপ্রায় অনুসারে, নির্ব্বিবাদে ও স্বাধীনভাবে নিজকে বিকশিত করিতে পারিত তাহা হইলে মানব জাতির শিক্ষা ও সভ্যতার ভাণ্ডারে তাহার দান আরও কত বেশী হইত?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এ জাতির মধ্যে অক্লান্ত কর্ম্ম প্রেরণা জাগাইতে পারিলে ভারতবর্ষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে—দুনিয়ার সমস্ত জাতিকে চমৎকৃত করিতে পারে। আমি একথাও বিশ্বাস করি যে, একবার এই ঘুমন্ত জাতির নিদ্রা ভঙ্গ হইলে

এ যুগের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিশীল পাশ্চাত্য জাতি সমূহকেও ছড়াইয়া যাইতে পারি। আজ আমাদের সেই যাদুকরের দণ্ডেরই প্রয়োজন —যে দণ্ড সঞ্চালনে আমাদের সমাজের সর্ব্বত্র সাজ সাজ রব উঠিবে। ফরাসী দার্শনিক বার্গসন "elan vital" অর্থাৎ প্রেরণা-দায়িণী শক্তির কথা বলিয়াছেন। এই শক্তিই সমগ্র জগতকে কর্ম্মের পথে, উন্নতির পথে সঞ্চালিত করে। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রেরণাদায়িণী শক্তি কি? স্বাধীনতার জন্য, সম্প্রসারণের জন্য, আত্ম-বিকাশের জন্য যে ঐকান্তিক আগ্রহ—তাহাই এই প্রেরণাদায়িণী শক্তি। আত্ম-বিকাশের এই যে ঐকান্তিক ইচ্ছা, তাহার অপর দিকই হইল বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আপনারা যদি স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আপনাদের চতুর্দ্দিকে যে বন্ধন রহিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে হইবে। এই বিদ্রোহ যদি সার্থক হয় তাহা হইলে আপনাদের স্বাধীনতালাভ অবশ্যম্ভাবী।

আত্ম-সম্মান-জ্ঞান যাহাদের একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহাদের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। ইহারা ছাড়া আর সকলেই দাসত্বের জ্বালা ও অপমান কিছু না কিছু অনুভব করেন। এই অনুভূতি যখন প্রখর হইয়া উঠে তখন দাসত্বের বন্ধন আর সহ্য হয় না; মানুষ তখন এই বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তাহার ব্যাকুলতা আরও বৃদ্ধি পায় তখনই যখন সে কোন-না-কোন উপায়ে প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে। স্বাধীন দেশের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা কিম্বা স্বাধীন আবহাওয়া হইতে উৎপন্ন সুখকর অবস্থার কথা পাঠ ও কল্পনা দ্বারা সাধারণ মানুষ

স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়া থাকে! দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। এই তপস্যা কি? জাতীয় অপমান এবং বর্ণগত বৈষম্য প্রভৃতির অনুভূতি প্রখর হইতে প্রখরতর করিতে হইবে, স্বাধীনতা লাভের জন্য যে আগ্রহ তাহাকে ক্রমে ক্রমে প্রবল হইতে প্রবলতর করিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে দেশকে মুক্ত করিতে হইলে এই তপস্যারই প্রয়োজন। ইতিহাস পাঠ করিয়া, আমাদের বর্ত্তমান অবনতি লক্ষ্য করিয়া, জীবনের আদর্শের কথা অনুধ্যান করিয়া এবং সর্ব্বোপরি স্বাধীন দেশের অবস্থার সহিত পরাধীন দেশের অবস্থার তুলনা করিয়াই আমরা জাতীয় মুক্তির জন্য প্রেরণা লাভ করিতে পারি।

আমি মনে করি—Baptism, Initiation ও দীক্ষা প্রভৃতির একটি মাত্র মানে হয়; তাহা এই যে, স্বাধীনতার বেদীতে জীবন উৎসর্গ করা। সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ এক দিনে সম্ভবপর হইবে না। আমরা যতই স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হইব ততই আমরা আনন্দের অনুভূতি পাইব। এই আনন্দের কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমরা ততই বুঝিতে পারিব যে- জীবনের একটা মহান্ অর্থ ও উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। তখনই বিপ্লব উপস্থিত হইবে— আমাদের চিন্তা, আমাদের অনুভূতি এবং আমাদের আশা ও আকাঙ্খা এই সমস্তই তখন পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে। তখন আমাদের নিকট কেবল একটী জিনিষই মূল্যবান্ বলিয়া মনে হইবে; আমরা কেবল স্বাধীনতারই উপাসনা করিব। আমাদের মনোবৃত্তিও তখন পরিবর্ত্তিত হইবে এবং

সেই আদর্শেরই অনুগামী হইবে। এই ক্রমিক পরিবর্ত্তনের অনুভূতি যে কিরূপ তাহা বর্ণনা করা যায় না। এই পরিবর্ত্তন যখন সম্পূর্ণ হইবে তখন আমাদের পুনর্জ্জন্ম হইবে; আমরা তখন প্রকৃত "দ্বিজ" হইব। অতঃপর আমরা কেবল স্বাধীনতার কথাই চিন্তা করিব, স্বাধীনতার স্বাদ-ই উপলব্ধি করিব এবং স্বাধীনতার কাহিনী-ই স্বপ্নে দেখিব। আমাদের সমস্ত কাজ কর্ম্মের মধ্য দিয়া তখন একটি মাত্র অভিপ্রায় প্রকাশ পাইবে—সেইটি হইবে স্বাধীনতা লাভের ঐকান্তিক আগ্রহ। এক কথায় বলিতে গেলে, আমরা তখন স্বাধীনতার নেশায় মত্ত হইব—স্বাধীনতাই তখন আমাদের জীবনের সর্ব্বস্ব বলিয়া পরিগণিত হইবে।

প্রাণের মধ্যে একবার স্বাধীনতা লাভের অতৃপ্ত আকাঙ্খা জাগ্রত হইলে ইহাকে চরিতার্থ করিবার জন্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে আমাদের সমস্ত শক্তি—শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক শক্তি সমূহ নিয়োগ করিতে হইবে। আমরা যে সমস্ত বিষয় লিখিয়াছি তাহার অনেকটা ভুলিতে হইবে এবং যাহা কখনও আমাদিগকে শিখান হয় নাই এমন অনেক বিষয় আমাদিগকে সর্ব্ব-প্রথম শিক্ষা করিতে হইবে। স্বাধীনতা লাভের যে গুরু কর্ত্তব্যভার ইহাকে বহন করিবার জন্য শরীর ও মনকে নূতন করিয়া গঠন করিতে হইবে, নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইবে, আমাদের জীবনের বাহ্যিক আবরণ দূর করিতে হইবে, বিলাসিতা এবং আমোদ-প্রমোদ বর্জ্জন করিতে হইবে, পুরাতন অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে

হইবে এবং নূতন জীবন-যাত্রা প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। এই ভাবেই আমাদের সমগ্র জীবন পরিপূর্ণ এবং পবিত্র হইয়া স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিবে।

মোটের উপর মানুষ একটা সামাজিক জীব। সমাজের অবশিষ্ট অংশ হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহার আত্মবিকাশ হইতে পারে না। জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি, পরিণতি ও পরিপুষ্টির জন্য ব্যক্তিকে বহুল পরিমাণে সমাজের উপর নির্ভর করিতে হয়। পক্ষান্তরে সমাজও ব্যক্তিকে বাদ দিয়া চলিতে পারে না। তারপর ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, সমগ্র সমাজের উন্নতি না হইলে একমাত্র ব্যক্তির উন্নতি দ্বারা বিশেষ ফল হয় না ; এরূপ ব্যক্তিগত উন্নতির খুব বেশী মূল্য থাকে না। যোগী সন্ন্যাসীর যে আদর্শ তাহা আমাদের সমাজের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নহে। সামাজিক জীবনের মধ্যে যাহার স্থান নাই, সে আদর্শের খুব বেশী মূল্য আছে বলিয়া আমি মনে করি না। সুতরাং স্বাধীনতাকেই যদি আমাদের জীবনের মূলনীতি বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, ইহাকেই যদি আমাদের সমস্ত কর্ম্ম-প্রচেষ্টার প্রেরণাদায়িনী শক্তি বলিয়া মনে করিতে হয়, তাহা হইতে আমাদের সমাজ সংস্কারের ভিত্তিও এই স্বাধীনতার উপরই প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, এই স্বাধীনতার নীতি মোটের উপর সামাজিক বিপ্লব ছাড়া আর কিছুই নহে।

সমগ্র সমাজের জন্য স্বাধীনতা বলিতে নারী ও পুরুষ—এই উভয়েরই স্বাধীনতা বুঝিতে হইবে। ইহাতে বুঝিতে হইবে—

কেবল উচ্চ শ্রেণী নয়, অনুন্নত শ্রেণীকেও স্বাধীনতা দিতে হইবে ধনী-দরিদ্র, যুবা-বৃদ্ধ, সকল সম্প্রদায়, সংখ্যায় লঘিষ্ঠ এবং সংখ্যায় গরিষ্ঠ সমাজ এবং সকল শ্রেণী ও সকল ব্যক্তিকেই স্বাধীনতা দিতে হইবে। এই দিক হইতে বিচার করিলে মনে হয়, স্বাধীনতা মানেই সাম্য এবং সাম্য মানেই ভ্রাতৃত্ব।

সমাজের বন্ধন-মুক্ত করিতে হইলে সামাজিক ব্যাপারে এবং আইনসঙ্গত বিষয়ে মহিলাদিগকে সমান অধিকার দিতে হইবে। যে সামাজিক বিধান দ্বারা, নিম্নবংশে জন্মগ্রহণের জন্য, কোন কোন ব্যক্তি ও শ্রেণীকে ছোট করিয়া রাখা হইয়াছে সেই বিধান নির্ম্মমভাবে বিনষ্ট করিতে হইবে। ধনী ও দরিদ্রের পদমর্য্যাদার মধ্যে যে প্রভেদ তাহা দূর করিতে হইবে। যে সমস্ত প্রতিবন্ধক সামাজিক উন্নতির পথে বিঘ্ন উৎপাদন করে তৎসমস্তই বর্জ্জন করিতে হইবে। প্রত্যেককে শিক্ষা ও আত্ম বিকাশের জন্য সমান সুযোগ দিতে হইবে। যুবককে যুবক বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না। সমাজ-সংস্কার এবং দেশ শাসনের ভার যুবক ও যুবতীদের উপরেই ন্যস্ত হইবে। সমাজে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে, আর্থিক ব্যাপারে—সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ব বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমান অধিকার দিতে হইবে—ইহাতে বৈষম্য রাখিলে চলিবে না। আমরা যে নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাই সেই সমাজের গোড়ার কথা হইবে—সকলের জন্য সমান অধিকার, সমান সুযোগ, ঐশ্বর্য্যের উপর সকলের সমান অধিকার, বৈষম্য মূলক সামাজিক বিধান প্রত্যাহার, জাতিভেদ প্রথার বিলোপ এবং বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্তি।

বন্ধুগণ, আপনারা হয়ত আমার এই কল্পনাকে আকাশ-কুসুম বলিয়া মনে করিতেছেন। কেহ কেহ হয়ত ভাবিতেছেন—আমি এক জন স্বপ্ন-বিলাসী, বাস্তব জগতের সহিত আমার কোনই সম্পর্ক নাই। যদি ইহাই আপনাদের মনে হয়, তাহা হইলে আমি নাচার; দোষ স্বীকার ভিন্ন আমার আর উপায় নাই। আমি নিজকে স্বপ্ন-বিলাসী বলিয়া স্বীকার করিতেছি। তবে আমি এই স্বপ্নই ভালবাসি। আমার নিকট কিন্তু এই সমস্ত স্বপ্নই কঠোর বাস্তব সত্য বলিয়া মনে হয়। এই স্বপ্ন হইতেই আমি উদ্দীপনা লাভ করি, কাজ করিবার শক্তি আমার প্রাণে জাগে। এই সমস্ত স্বপ্ন না থাকিলে আমার পক্ষে জীবন ধারণ করাই অসম্ভব; কারণ তাহা হইলে জীবনের আর কোন মাধুর্য্যই থাকে না। এই সমস্ত স্বপ্ন ছাড়া সমগ্র জীবনটাই আমার নিকট ব্যর্থ বলিয়া মনে হয়।

আমি যে স্বপ্ন ভালবাসি— সে হইতেছে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন; আপনার প্রভায় গৌরবান্বিত সমুজ্জল ভারতের স্বপ্ন। আমি চাই— এই ভারতের তাহার নিজ সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হউক; তাহার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার তাহারই হস্তগত হউক। আমি চাই—এদেশে একটা স্বাধীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হউক, তাহার সৈন্য, তাহার নৌবল, তাহার বিমানপোত তাহার সমস্তই স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র হউক আমি চাই—পৃথিবীর স্বাধীন দেশসমূহে স্বাধীন ভারতের দূত প্রেরণ করা হউক। আমি দেখতে চাই—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যাহা কিছু মহত্তর তৎসমস্তেরই গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া এই ভারতমাতা, সমগ্র জগতের সমক্ষে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনীরূপে

দণ্ডায়মান হউক। আমি চাই—এই ভারত দেশে দেশে পরিপূর্ণ সত্যের বাণী, সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার বাণী প্রেরণ করুক।

ছাত্র-বন্ধুগণ, আজ আপনারা ছাত্র হইলেও আপনারাই জাতির ভবিষ্যৎ আশা, ভারতের মঙ্গল। এদেশের ভবিষ্যৎ আপনাদের উপর নির্ভর করিতেছে। আপনারাই স্বাধীন ভারতের ভাবী বংশধর হইতে চলিয়াছেন। আমি তাই আপনাদিগকে সাদরে আহ্বান করি—আপনারা আমার আশা আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নাবলীর কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করুন। ইহা ছাড়া আমার আর কিছু-ই নাই; আর কিছুই আমি আপনাদিগকে দান করিতে পারি না। আমার এই দান আপনারা গ্রহণ করিবেন কি? আপনারা বয়সে তরুণ, আপনাদের হৃদয় আশায় ভরপূর। আপনাদের সম্মুখেই বৃহত্তর ও মহত্তর আদর্শের স্থান হওয়া উচিত। এই আদর্শ যতই উচ্চতর হইবে ততই আপনাদের সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হইবে। অতএব হে ছাত্রগণ, উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। জীবিকার্জ্জনের জন্য শিক্ষানবিশী করাই কেবল ছাত্র জীবনের কর্ত্তব্য নহে; তদপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রস্তুত হওয়াই ছাত্র জীবনের কর্ত্তব্য। কারণ, কেবল অন্নবস্ত্র পাইলেই মানুষ জীবন ধারণ করিতে পারে না। আমি আপনাদের সম্মুখে ভবিষ্যতের একটি চিত্র উপস্থিত করিয়াছি। এই অনাগত যুগের জন্য আপনাদিগকে কিছু না কিছু কাজ করিতে হইবে, কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে এবং নির্য্যাতন ভোগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করিয়া আপনাদের দেহ ও মনকে গঠন করিতে হইবে।

আপনাদের শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই এই লক্ষ্য অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

আমি যে জীবনের চিত্র আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি তাহাতে দুঃখ কষ্ট এবং নির্য্যাতন আসিতে পারে—একথা অস্বীকার করি না। তবে এ কথায় বিশ্বাস করুন যে, ইহাতে আনন্দও কম পাইবেন না। আমি যে পথের কথা বলিলাম তাহা কণ্টকাকীর্ণ হইতে পারে। কিন্তু এই পথই কি একমাত্র গৌরবের পথ নহে? আমি তাই আপনাদিগকে আহ্বান করি,—আসুন আপনারা, আমরা সকলে এক দলে মিলিত হইয়া হাত ধরাধরি করিয়া গন্তব্য পথে যাত্রা করি। তাহা হইলেই আমাদের মানব জীবন ধন্য হইবে। দুঃখ-কষ্ট, নির্য্যাতন ও নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে পা ফেলিয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে বটে; তবে শেষ পর্য্যন্ত আমরা অবশ্যই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিব, পরমানন্দ এবং অমরত্ব লাভ করিতে পারিব। —বন্দেমাতরম্।*

* ১৯২৯ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে অমরাবতীতে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের ছাত্র সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ। ইংরাজী হইতে অনূদিত।

যুব-আন্দোলন

"যে প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের মূলে স্বাধীন চিন্তা ও নূতন প্রেরণা নাই, সে প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলন তরুণের প্রতিষ্ঠান বা তরুণের আন্দোলন বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না।"

*
* *

পাবনা জেলার যুব-সম্মিলনীর সভাপতিপদ প্রদান করিয়া আমাকে যে সম্মান দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুণ। আপনাদের এই প্রসিদ্ধ নগরীতে আসিবার সৌভাগ্য ইতিপূর্ব্বে আমার কখন হয় নাই; যদিও এখানে আসার বাসনা বহুদিন হইতে মনের মধ্যে ছিল। আজ এই বাসনা পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। বাঙ্গলার জাতীয় জীবনে জটিল সমস্যা যখনই উপস্থিত হইয়াছে এবং মতানৈক্য যখন মনোমালিন্যে পরিণত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে এইরূপ সময়ে একাধিকবার এই প্রসিদ্ধ নগরীতে মীমাংসা ঘটিয়াছে। আজ দেশের যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আমি আশা করি যে জাতীয় সমস্যার সমাধানে প্রবীণ ও বিচক্ষণ পাবনা জিলাবাসী যাবতীয় দেশহিতকর কর্ম্মপ্রচেষ্টায় অগ্রণী হইয়া পথ প্রদর্শকের কাজ করিবেন।

যখন চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেশ-বিদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখন কি দেখিতে পাই?—দেখিতে পাই চারিদিকে জীবনের স্পন্দন, জাগরণের সমুদয় লক্ষণ ও নবসৃষ্টির উন্মেষ। পৃথিবীর

একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তরুণের প্রাণ জাগিয়াছে। দুর্ব্বলতা, অবিশ্বাস ও ক্লৈব্য পরিহার করিয়া সে আপনার পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতেছে। ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী যাহারা সেই তরুণ সম্প্রদায় আজি নিশ্চেষ্ট নয়। তাহারা আজ অধিকার লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছে এবং অধিকার সংরক্ষণের জন্য যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেছে। তরুণের এই নব জাগরণ পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন ঘটনাটা নয়; ইহাকে পাশ্চাত্য বস্তু জ্ঞান করিলে আমরা অন্যায় করিব। সকল দেশে ও সকল যুগে ধ্বংস ও সৃষ্টির আবশ্যকতা যখনই ঘটিয়াছে তখনই তরুণের প্রাণ জাগিয়াছে। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন বজ্রনির্ঘোষে বলিয়াছেন "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ" তখন তাহার ভিতর দিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণ শক্তির বাণী প্রকট হইয়াছিল। তাই গত বৎসর নাগপুরে তরুণদের সভায় আমি একদিন বলিয়াছিলাম "The voice of Krishna was the voice of immortal Youth"। ধ্বংসের করাল মূর্ত্তি দেখিয়া অর্জ্জুন ভীতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন; ক্ষণিকের জন্য তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে ধ্বংস বিনা সৃষ্টি হইতে পারে না; তাই শ্রীমদ্‌ভগবৎ গীতার সাহায্যে তাহাকে বুঝাইতে হইয়াছিল যে কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানের উপরেই ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে তরুণের আদর্শ কি? তরুণের আদর্শ—বর্ত্তমানের সকল প্রকার বন্ধন, অত্যাচার, অবিচার ও অনাচার ধ্বংস করিয়া নূতন সমাজ ও নূতন জাতি সৃষ্টি করা। প্রাচীনের

ও বর্ত্তমানের উচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া সুদূরের সন্ধান পাইবার জন্য মানবের দৃষ্টি অতি আদিম কাল হইতে উৎসুক আছে। শুধু তাই নয়, সুদূরের স্বপ্নকে বাস্তবের মধ্যে মূর্ত্ত করিবার চেষ্টা মানবজাতি বরাবর করিয়াছে। এই প্রেরণার ফলে অতি প্রাচীন-কালে ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয় এবং প্রাচীন গ্রীসে সক্রেটীস, প্লেটো প্রভৃতি মনীষিবৃন্দের অভ্যুদয় হয়।

আমরা মনে করিতে পারি যে তরুণদের রচিত যে কোন প্রতিষ্ঠান—যেমন সেবাসমিতি—যুবক সমিতি বা তরুণসঙ্ঘ আখ্যা পাইবার যোগ্য, কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। যে প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের মূলে স্বাধীন চিন্তা ও নূতন প্রেরণা নাই সে প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলন তরুণের প্রতিষ্ঠান বা তরুণের আন্দোলন বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। তরুণ প্রাণের লক্ষণ কি?—লক্ষণ এই যে সে বর্ত্তমানকে বা বাস্তবকে অখণ্ড সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না, সে বন্ধনের বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে চায় এবং সে চায় আনিতে ধ্বংসের মহাশ্মশানের বুকে সৃষ্টির অবিরাম তাণ্ডব নৃত্য। ধ্বংস ও সৃষ্টি লীলার মধ্যে যে আত্মহারা হইতে পারে একমাত্র সেই ব্যক্তিই তরুণ। তারুণ্য যার আছে সে ধ্বংস ও সংগ্রামের ছায়া দর্শনে ভীত হয় না অথবা নব-সৃষ্টিরূপ কার্য্যে অপারগ হয় না। বৃদ্ধ হইয়াও মানুষ তরুণ হইতে পারে যদি তার প্রাণ সবুজ থাকে আর তরুণ হইয়াও মানুষ বৃদ্ধ হইতে পারে যদি তার অবস্থা হয় "বৃদ্ধত্বম্ জরসা বিনা।"

বহুদিন যাবৎ তরুণশক্তি আত্মবিস্মৃত ছিল, তাই কলুর বলদের

মত সে পরের কশাঘাত খাইয়া পরের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়াছে—এবং দায়িত্বভার অপরের হাতে তুলিয়া দিয়া অন্ধের মত কাজ করিয়া আসিয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত এরূপ অবস্থায় সমাজের ও জাতীয় ক্রমিক উন্নতি ঘটিয়াছে, ততদিন পর্য্যন্ত বিশেষ কোন গোলমাল সৃষ্টি হয় নাই; কিন্তু যে দেশে বা যে যুগে নেতৃবর্গের অযোগ্যতার জন্য সমাজের ও জাতির দুর্গতি ঘটিয়াছে সেখানে তরুণসম্প্রদায় বিদ্রোহী হইয়াছে। সুলতানের হাতে সমস্ত শক্তি ও কর্ত্তব্যভার অর্পণ করিয়া তুর্কি জাতি যখন ক্রমশঃ অধোগতির মুখে চলিতে লাগিল, তখন বিদ্রোহী তুর্কি-তরুণেরা নব্য তুর্কিদের প্রতিষ্ঠা করে। সম্রাট কাইজার ও তাঁহার পারিষদ্‌বর্গ যখন সেনা-প্রতিকুলের হস্তে সমস্ত দায়িত্ব তুলিয়া দিল, তরুণ জার্ম্মাণী তখন নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না—বিশেষ করিয়া যখন তরুণ জার্ম্মাণেরা দেখিল যে তাহাদের নেতৃত্বের ফলে মহাযুদ্ধে সমগ্র জার্ম্মাণ জাতিকে পরাজয়ের লাঞ্ছনা ও দৈন্য বরণ করিতে হইল; তখন জার্ম্মাণীতে তরুণের আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিল। মাঞ্চুরাজ-বংশকে স্বীয় ভাগ্যনিয়ন্তা করিবার ফলে সমগ্র চীন জাতি যখন শৌর্য্য, বীর্য্য, স্বাধীনতা ও সম্পদ হারাইতে লাগিল, তখন চীন দেশে তরুণের জাগরণ আরম্ভ হইল। যে পরিমাণে তরুণ সম্প্রদায় আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইয়াছে এবং দায়িত্বজ্ঞান-প্রণোদিত হইয়াও সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল হইয়া স্বীয় জাতির উদ্ধার সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছে সেই পরিমাণে তরুণ আন্দোলনের প্রসার হইয়াছে। আজ যে আমরা ভারতের একপ্রান্ত হইতে

অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তরুণের জাগরণ দেখিতেছি তাহার অর্থ—এই ভারতের তরুণশক্তি আত্মবিশ্বাসী হইয়াছে, স্বীয় জাতীয় উদ্ধারসাধনের ভার গ্রহণ করিয়াছে এবং আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।

কেহ কেহ অজ্ঞতা বশতঃ মনে করিয়া থাকেন যে যুব-আন্দোলন রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের নামান্তর মাত্র—কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। ফুল যখন ফোটে তখন প্রত্যেক পাপড়ির মধ্যে তার সুষমা ও সৌরভ আত্মপ্রকাশ লাভ করে। বহুদিন শয্যাশায়ী থাকার পর মানুষ যখন পূর্ব্বস্বাস্থ্য ফিরিয়া পায় তখন শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের ভিতর দিয়া শক্তি, তেজ ও প্রফুল্লতা ফুটিয়া উঠে। শৈশব ও কৈশোর পার হইয়া আমরা যখন যৌবন-রাজ্যে অভিষিক্ত হই তখন প্রকৃতিদেবী সকল সম্পদে আমাদিগকে ভূষিত করেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক তেজ, নৈতিক বল, শৌর্য্য, বীর্য্য—সব দিক দিয়া আমরা মানুষ হইয়া উঠি। ব্যক্তির জীবনে যতগুলি দিক আছে এবং জাতির জীবনে যতগুলি দিক আছে—ততগুলি দিক আছে যুব-আন্দোলনের। এই বিচিত্র আন্দোলনের বিভিন্ন রূপের মধ্যে কোনও রূপটি হেয় নয়। এই রূপের সমষ্টিতে যে অভিনব সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি হয় তাহাই যুবক মাত্রেরই কাম্য ও সাধ্য। যুব-আন্দোলন রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন নয়, কিন্তু তা বলিয়া ইহা non-political নয়; রাজনীতি বর্জ্জন করা এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য নয়। এই আন্দোলনে রাষ্ট্র-নীতির স্থান আছে, যেমন জাতীয় আন্দোলনেও রাষ্ট্রনীতির স্থান

আছে। কিন্তু তার জন্য আমরা বলিতে পারি না যে জাতীয় আন্দোলন—রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন মাত্র।

কাব্য, সাহিত্য, শিল্পকলা, দর্শনবিজ্ঞান, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যায়াম ক্রীড়া, সমাজ ও রাষ্ট্র এই সবের মধ্য দিয়া জাতীয় জীবনের বিকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং এই সবের ভিতর দিয়া তরুণের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়া থাকে। অন্তরের প্রাণ যখন জাগে তখন সুপ্তোত্থিত প্রাণধারা শতমুখী হইয়া নিজেকে প্রকট করে। কোন্ মন্ত্রবলে সুপ্তশক্তির বোধন হইতে পারে তাহাই অনুসন্ধানের বিষয়।

অনেকের ধারণা যে জনসাধারণকে বা তরুণসমাজকে জাগাইতে হইলে রাষ্ট্র বা সমাজ সম্পর্কীয় মতবাদ প্রচার করিতেই হইবে। সমাজ বা রাষ্ট্রের আদর্শ কি হওয়া উচিত এ বিষয়ে আজ কাল অনেক প্রকার মতবাদ (বা "Ism") প্রচলিত আছে যথা—Anarchism, Socialism, Communism, Bolshevism, Syndicalism, Republicanism, Constitutional mouarchy, Fascism ইত্যাদি। এক একটী "ism" এর গোঁড়া ভক্তেরা মনে করেন যে ঐ মতের প্রতিষ্ঠা হইলে পৃথিবীর সকল দুঃখ দূর হইবে। আজকাল তাই কোনও কোনও দেশে "ism" এর লড়াই খুব ঘনাইয়া উঠিয়াছে। আমার নিজের কিন্তু মনে হয় যে কোনও ismএর বা মতবাদের দ্বারা মানব জাতির উদ্ধার হইতে পারে না, যদি সর্ব্বাগ্রে আমরা মানুষোচিত চরিত্রবল লাভ না করিতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলিতেন—man-making is my mission—মানুষ তৈরি করা আমার জীবনের উদ্দেশ্য।

জাতিগঠনের এবং ism প্রতিষ্ঠার ভিত্তি—খাঁটি মানুষ। খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করা যুব-আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করিতে হইলে সবদিক দিয়া তাহার বিকাশ হওয়া চাই। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইবে যে যুব-আন্দোলনের সহিত Socialism বা সমাজতন্ত্র-বাদের অভেদ প্রতিপন্ন করা ঠিক নয়। সব "ism" এর মূলে যে সমস্যা—সেই সমস্যার সমাধান করা যুব-আন্দোলনের অন্যতম আদর্শ।

তরুণ-আন্দোলনের দুইটী দিক আছে—আন্তর্জাতিকতার দিক ও জাতীয়তার দিক। আন্তর্জাতিকতার দিক হইতে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য—বিশ্বমানবকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা। দেশ ও জাতি নির্ব্বিশেষে মানুষে মানুষে যে ভাইয়ের সম্বন্ধ—এ ভাব তরুণ-আন্দোলনের দ্বারা স্পষ্ট হইয়াছে। আন্তর্জাতিক যুব-সম্মেলনের অধিবেশন এই ভাব সঞ্চারের সহায়তা করিয়া থাকে। আজ আসমুদ্র তরুণ-জাতি অনুভব করিতেছে যে সব দেশে ও সব যুগে তরুণের আদর্শ, প্রেরণা, সাধনা ও অনুভূতি মূলতঃ একই। বিশ্বের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আত্মীয়তা ও অভেদাত্ম-ভাব ঘনীভূত হইলে ইহার প্রভাব যে কতদূর পৌঁছিবে তাহা চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে বিদ্বেষ-বহ্নি এখন প্রজ্জ্বলিত আছে তাহা যদি নির্ব্বাপিত করিতে হয় তাহা হইলে দেশে দেশে আন্দোলনের খুব প্রসার হওয়া উচিত। বিভিন্ন জাতির মধ্যে যাহাতে যুদ্ধবিগ্রহ না হয় এবং পৃথিবীতে শান্তি যাহাতে স্থাপিত

হয় এই উদ্দেশ্যে অনেক দেশের তরুণেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। তরুণেরা এতদিন পরে বুঝিতে পারিয়াছে যে কূটরাজনীতিবিৎদের হাতে তাহারা ক্রীড়ার পুত্তলিকার মত। কামান বন্দুকের সম্মুখে তাহাদিগকেই বারে বারে অগ্রসর হইয়া আত্ম-বলিদান করিতে হইবে—অথচ এমন অনেক যুদ্ধ হয় যাহা শুধু কূট চক্রান্তের ফল এবং তাহার দ্বারা কোনও জাতির প্রকৃত কল্যাণ হয় না। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা এখন ব্যর্থ হইবেই হইবে কারণ আজ অনেক জাতি শৃঙ্খলিত ও পরপদ দলিত। যে পর্য্যন্ত তাহারা সকলে মুক্ত না হইতেছে সে পর্য্যন্ত শান্তির অর্থ দাসত্ব ও পরাধীনতা। তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে যদি কোনও দিন পৃথিবীতে শান্তি সংস্থাপিত হয়—তবে বিশ্বের তরুণ সমাজই তাহার স্থাপনা করিবে।

শান্তি সংস্থাপনের চেষ্টা ব্যতীত অন্যান্য অনেক বিষয়ে দেশ বিদেশের তরুণেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে শিখিবে। মানুষের স্বভাব সব দেশেই মোটের উপর একই রকম এবং মানব-জীবনের সমস্যাগুলি সর্ব্বদেশে ও সর্ব্ব যুগে প্রায় একই প্রকার। এ অবস্থায় বিভিন্ন দেশের তরুণ সমাজ আন্তর্জাতিকতার সূত্রে আবদ্ধ হইলে যে পরস্পরের সাহায্য করিতে পারেন একথা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি।

জাতীয়তার দিক হইতে যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য—নূতন আদর্শে নূতন জাতি গড়িয়া তোলা। নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে হইলে জাতীয় অভ্যুত্থান ও পতনের নিয়ম বা কারণ প্রথমে

আবিষ্কার করিতে হইবে। আমরা মনে করিতে পারি যে প্রচীন কাল হইতে বিভিন্ন জাতীর যে অভ্যুত্থান ও পতন দেখা যাইতেছে ইহার পশ্চাতে বিধির কোন বিধান নাই। এই বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশে বহু চিন্তা ও গবেষণা হইয়া গিয়াছে এবং কোন কোন বৈজ্ঞানিক এই অভ্যুত্থান ও পতনের কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের গবেষণার সার মর্ম্ম এই যে, ব্যক্তির জীবনে যেরূপ জন্ম মৃত্যু বিকাশ আছে, জাতীর জীবনেও তদ্রূপ জন্ম, উন্নতি ও মৃত্যু আছে। জীবনীশক্তি হ্রাস পাইলে ব্যক্তি যেরূপ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, জাতিও তদ্রূপ মুমূর্ষু হইয়া পড়ে। কখনও জাতিবিশেষে ধরাপৃষ্ঠ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং মাত্র ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়, কখনও বা জাতিবিশেষ একেবারে বিলুপ্ত না হইয়া নররূপী পশুর মত কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে থাকে। যে জাতি নিতান্ত ভাগ্যবান্ সে জাতি মৃত্যুর দ্বারদেশে উপনীত হইয়াও আবার পুনর্জ্জন্ম লাভ করে। কিরূপ অবস্থায় জাতির পুনর্জ্জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহাও কোন কোন বৈজ্ঞানিক নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিভিন্ন জাতির রক্ত সংমিশ্রণের ফলে এবং বিভিন্ন শিক্ষার (culture) সংস্পর্শের ফলে জাতীর এবং জাতীয় সভ্যতার পুনর্জ্জন্ম হইতে পারে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের বাণী আমরা গ্রহণ করি আর না করি একথা বোধ হয় স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির মধ্যে রক্ত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির আগমনের ফলে এই ভারতভূমি

বিভিন্ন শিক্ষা-ধারার সঙ্গমস্থলে পরিণত হইয়াছে। হয়ত, এই সংমিশ্রণের দরুণই ভারতীয় জাতি ও ভারতীয় সভ্যতা বারবার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে এবং তাহারই ফলে এই প্রাচীন জাতি অমর হইয়া পৃথিবীর বক্ষে বাস করিতেছে।

বিভিন্ন জাতি বা বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে রক্ত সংমিশ্রণের পরিণাম সম্বন্ধে আমাদের মত যাহাই হউক না কেন এ কথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবে না যে বিভিন্ন সভ্যতার ও শিক্ষার (culture) সংঘর্ষের দরুণ চিন্তা জগতে বিপ্লব উপস্থিত হয়। এই বিপ্লবই জাতির চৈতন্যের লক্ষণ। ইংরাজ এদেশে আসার পর আমাদের চিন্তাজগতে একটা বড় রকমের ওলট্-পালট্ হইয়াছিল। ইহা বর্ত্তমান যুগের নব জাগরণের সূত্রপাত। তারপর হইতে আমরা অন্তর্দৃষ্টি ফিরিয়া পাইয়াছি, নিজেদের বর্ত্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে শিখিয়াছি এবং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত একদিকে আমাদের প্রাচীন অবস্থা তুলনা করিয়াছি এবং অপর-দিকে স্বাধীন জাতির অবস্থা তুলনা করিয়াছি। নিজেদের বর্ত্তমান অবস্থার হীনতা ও লাঞ্ছনার অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা গৌরবময় ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতে শিখিয়াছি। যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন আমরা দেখিতে শিখিয়াছি তাহা আমাদের গৌরবময় অতীত হইতেও অধিক গরিমাময়। এই স্বপ্ন বা আদর্শবাদের মধ্যে সৃষ্টির বীজ লুকাইত। জাতিকে যদি জাগাইতে হয় তাহা হইলে বর্ত্তমানের প্রতি প্রবল অসন্তোষ সৃষ্টি করিতে হইবে এবং এক উচ্চ আদর্শের

ধ্যান করিতে শিখাইতে হইবে তাই আমাদের যুব আন্দোলনের একদিকে আছে অসন্তোষ, আর এক দিকে আছে আদর্শের আকর্ষণ।

কোন মতবাদকে ভিত্তি করিয়া নূতন সমাজ গড়িবার চেষ্টা করিব এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। আমি এ ক্ষেত্রে এ আলোচনায় প্রবেশ করিব না; আমি শুধু মূল আদর্শের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। যে মতবাদ বা ism আপনি গ্রহণ করুন না কেন, তাহা যদি সার্থক করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে অতীত ইতিহাসের ধারা, আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও চারিদিকের আবহাওয়া স্মরণ করিয়া কাজ করিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ আমি বলিতে চাই যে কার্ল-মার্কসের নীতি কাজে পরিণত করিবার সময় বর্ত্তমান রুশ জাতি বা বলশেভিকগণ এমন পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন যাহা প্রকৃতপক্ষে কার্লমার্কসের মূল নীতির বিরোধী। অনেকের ধারণা আছে যে Socialism অথবা Republicanism বুঝি বা পাশ্চাত্য সামগ্রী, কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। Socialism ও Republicanism প্রাচীন ভারতের অবিদিত ছিল না এমন কি বর্ত্তমান যুগে ও ভারতের কোন কোন নিভৃত প্রান্তে তার নিদর্শন পাওয়া যায়।

এই সব মতবাদ বা প্রতিষ্ঠান প্রাচ্যও নয় অথবা পাশ্চাত্যও নয় —ইহা বিশ্বমানবের সম্পত্তি। ভারত আজ যদি কায়মনোবাক্যে Socialism গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করে, তাহা হইলেই যে ভারত

বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে সে আশা আমি করি না কিন্তু যে ism বা মতবাদ আমরা গ্রহণ করি না কেন, ইতিহাসের ধারা ও বর্ত্তমানের প্রয়োজন উপেক্ষা করিলে আমাদের সৃষ্টি কার্য্য কখনও সার্থক বা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিবে না।

আজ ভারতের এই হীন অবস্থা কেন? আছে তো সবই—প্রকৃতি, সৌন্দর্য্য, শারীরিক বল, শিক্ষা, দীক্ষা, শৌর্য্য, বীর্য্য, বিদ্যা, বুদ্ধি এর কোনটীর তো অভাব নাই; এ সব উপাদান লইয়া আমরা এক নিখুঁত মূর্ত্তি রচনা করিতে পারি কিন্তু প্রাণ প্রতিষ্ঠার আয়োজন কোথায়? প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে সেই দিন—যেদিন সমগ্র জাতির মধ্যে মুক্তিলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইবে। কোথায় সে পুরোহিত যে মৃতসঞ্জীবনী সুধা আহরণ করিয়া মুমূর্ষু জাতীর দেহ-পিঞ্জরের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে? যে ব্যক্তি মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছে, মুক্ত হইবার জন্য এবং জাতিকে মুক্ত করিবার জন্য যে ব্যক্তি পাগল হইয়াছে, সে ব্যক্তি অপরকে পাগল করিতে পারে এবং সেই ব্যক্তি জাতীয় যজ্ঞের পুরোহিত হইবার যোগ্য। আমাদের এই যুব-আন্দোলন এইরূপ শতসহস্র পুরোহিত সৃষ্টি করুক!

আমাদের আছে সবই নাই শুধু এক বস্তু – নিঃশেষে আত্ম-বলিদান—সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, যাবতীয় বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া একটা আদর্শের পশ্চাতে সারাটী জীবন অনুধাবনের ক্ষমতা। এই ক্ষমতা, এই tenacity of purpose আমাদের নাই, ইরংরাজের আছে—তাই ইংরাজ এত বড় আর আমরা এত হীন;

আমরা অন্তরের সঙ্গে দেশকে ভালবাসি না, স্বজাতিকে ভালবাসি না তাই আমরা করি গৃহবিবাদ, তাই আমাদের মধ্যে জন্মায় মিরজাফর উমিচাঁদ। মিরজাফর ও উমিচাঁদ আজও মরে নাই—এখনও তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা যদি দেশকে ভালবাসিতে শিখি তাহা হইলে আত্ম-বলিদানের ক্ষমতা লাভ করিব, আমাদের চরিত্রে অবিরাম ও অশ্রান্ত পরিশ্রমে ক্ষমতা tenacity of purpose ফিরিয়া আসিবে। এই দুইটী বল—tenacity of purpose বা moral stamina কোথায় পাইব? বনে জঙ্গলে যুগ যুগান্তর তপস্যা করিলেও পাইব না। পাইব নিষ্কাম কর্ম্মের মধ্যে জীবন ঢালিয়া দিলে—অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত হইলে। ঘরের কোণে বসিয়া উপাসনা করিলে বা সংসার ত্যাগ করিলে, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে—সাধনা বা শক্তি সঞ্চয় হয় না।

শক্তিপূজা কথার কথা না
যদি কথার কথা হ'ত তবে চিরদিন ভারত
শক্তিপূজে শক্তিহীন কভূ হ'ত না॥

সাধনার স্বরূপ তাই স্বামী বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এই ভাবে

"পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার,
সদা পরাজয়,
তাহা না ডরাক তোমা,
হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।"

এই কর্ম্ম সংগ্রামে অবিরতভাবে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারিলে শক্তিলাভ হইবে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই পৃথিবীর স্বাধীন জাতিরা শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের তরুণ সমাজ এই পথে চলুক; তাহা হইলে আমরা ফিরিয়া পাইব আমাদের লুপ্ত গৌরব, ফিরিয়া পাইব আমাদের প্রাচীন বিভব, ফিরিয়া পাইব আমাদের স্বাধীনতার ঐশ্বর্য্য আর বিশ্বের এই মুক্ত প্রাঙ্গণে আবার শির উন্নত করিয়া মানুষের মত চলিতে শিখিব।

শনিবার ২৭শে মাঘ, ১৩৩৫ পাবনা যুব-সম্মিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।]

দুই

"সমাজ বা রাষ্ট্রের উন্নতিনির্ভর করে—একদিকে ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপর আর অপর দিকে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার শক্তির উপর। যদি নূতন স্বাধীন ভারত আমাদিগকে গড়িতে হয় তবে একদিকে খাঁটিমানুষ সৃষ্টি করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে যাহা দ্বারা আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে শিখি।"

* *

আমি আজ আপনাদেরই একজন হইয়া এই সভায় আসিয়াছি। জ্ঞানের সম্ভার আমার নাই; বয়সের গুণে মানুষ যে অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ও সাবধানতা লাভ করে—তাহাও বোধ

হয় আমার নাই। সুতরাং উপদেশ দিবার ধৃষ্টতা লইয়া আমি এখানে আসি নাই। তবে আমি বিশ্বাস করি না যে পলিত-কেশ না হইলে মানুষ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। হইতে পারে, আজ ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড বাছিয়া বাছিয়া এমন লোককে মন্ত্রী করিতেছেন যাঁহাদের বয়স পঞ্চাশের অধিক। কিন্তু এই ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে অতি সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় একজন তরুণ-যুবক রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে তুর্কী, ইটালী, চীন প্রভৃতি বহু নব জাগ্রত জাতির মধ্যে যুবকদেরই হস্তে সমাজের ও রাষ্ট্রের কত গুরুভার ন্যস্ত হইয়াছে!

ধ্বংসের অথবা সৃষ্টির যেখানে প্রয়োজন, সেখানে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক যুবকদের উপর নির্ভর করিতে হইবে, তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে, তাহাদের হাতে ক্ষমতা ও দায়িত্ব তুলিয়া দিতে হইবে। যেখানে সংরক্ষণরই বেশী প্রয়োজন—যেখানে নানা কৌশলপূর্ণ সংরক্ষণ-নীতির উদ্ভাবনই প্রধান কাজ—সে ক্ষেত্রে আপনি প্রৌঢ়াবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অথবা গলিত দন্ত পলিত-কেশ বৃদ্ধকে সমাজের রাষ্ট্রের পুরোভাগে বসাইতে পারেন। আমাদের দেশ, আমাদের জাতি—ধ্বংস ও সৃষ্টির লীলার মধ্য দিয়া চলিয়াছে। আজ তাই তাহাদের ডাক পড়িয়াছে যাহারা সবুজ, যাহারা নবীন, যাহারা কাঁচা, যাহারা আপাত-দৃষ্টিতে লক্ষ্মীছাড়া।

আমি জানি আমাদের সমাজের এখনও অনেক লোক আছেন

যাঁহাদের মতে youth is a crime, তাঁহাদের মতে বয়সে তরুণ হওয়ার মত ত্রুটি বা অপরাধ আর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু সে মনোভাবের পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার। তবে যৌবনের অর্থ যে অসংযম বা অকর্ম্মণ্যতা বা অবিমৃষ্যকারিতা নয়—এ কথা প্রতিপন্ন করিতে হইলে শুধু নিজেদের সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, কর্ম্মের দ্বারা ও যোগ্যতার দ্বারা তাহা করিতে হইবে।

আজ বয়োজ্যেষ্ঠগণ তরুণ সমাজকে অকর্ম্মণ্য বা অপদার্থ জ্ঞান করিতে পারেন কিন্তু যুবকেরা যদি এই সঙ্কল্প করে যে তাহারা চরিত্রগুণে এবং সেবা ও কর্ম্মক্ষমতার দ্বারা বয়োজ্যেষ্ঠগণের হৃদয় অধিকার করিবে এবং তাহাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে তাহা হইলে কে বাধা প্রদান করিতে পারে ?

পৃথিবীব্যাপী যে যুব-আন্দোলন বা youth movement এখন চলিতেছে—ইহার স্বরূপ কি, উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপদ্ধতি কি—সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা সকলেরই নাই। যুবক ও যুবতীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যে কোনও আন্দোলন সুরু করিলে সে আন্দোলন যে "যুব-আন্দোলন" আখ্যার যোগ্য হইবে—এ কথা বলা যায় না। বর্ত্তমান অবস্থা এবং বাস্তবের কঠিন বন্ধনের প্রতি প্রবল অসন্তোষ হইতেই যুব-আন্দোলনের উৎপত্তি। তরুণ প্রাণ কখনও বর্ত্তমানকে, বাস্তবকে চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না! বিশেষতঃ যেখানে সে বর্ত্তমানের মধ্যে, বাস্তবের মধ্যে, অত্যাচার, অবিচার বা অনাচার দেখিতে পায় সেখানে তাহার সমস্ত প্রাণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে—সে ঐ অবস্থার একটা আমূল পরিবর্ত্তন করিতে

সাহসী হয়। যুব-আন্দোলনের উৎপত্তি প্রবল অসন্তোষ হইতে —ইহার উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে, সমাজকে, রাষ্ট্রকে নূতন আদর্শে নূতন ভাবে গড়িয়া তোলা। সুতরাং আদর্শবাদই যুব-আন্দোলনের প্রাণ।

যুবকদের বর্ত্তমান যুগে কি করা উচিত সে বিষয়ে একটা বিস্তৃত তালিকা দিয়া আমি আপনাদের বুদ্ধিবৃত্তির অবমাননা করিতে চাই না। আমি কয়েকটী মূল কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। সমাজ বা রাষ্ট্রের উন্নতি নির্ভর করে—একদিকে, ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপর এবং অপরদিকে, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার শক্তির উপর। যদি নূতন স্বাধীন ভারত আমাদিগকে গড়িয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে একদিক দিয়া খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে যাহার দ্বারা আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে শিখি। ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইলেই যে সামাজিক বৃত্তির (social qualities) বিকাশ হইবে—এ কথা মনে করা উচিত নয়। ব্যক্তিত্ব ফুটাইবার জন্য যেরূপ গভীর সাধনা আবশ্যক, সামাজিক বৃত্তির বিকাশের জন্যও সেরূপ সাধনা প্রয়োজন। ভারতবাসী যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ আমাদের সামাজিক বৃত্তির অভাব। আমাদের সমাজে কতকগুলি anti-social (বা সমাজ গঠন-বিরোধী) বৃত্তি প্রবেশ করিয়াছিল, যাহার ফলে আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার শক্তি ও অভ্যাস হারাইয়াছিলাম।

উদাহরণ স্বরূপ আমি বলিতে পারি যে সন্ন্যাসের প্রতি আগ্রহ যে দিন আমাদের মধ্যে দেখা দিল, সে দিন সমাজের ও রাষ্ট্রের বন্ধন শিথিল হইতে আরম্ভ করিল এবং সমাজের বা রাষ্ট্রের উন্নতি অপেক্ষা নিজের মোক্ষ লাভই মানুষের নিকট অধিক শ্রেয়স্কর বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল।

আমার নিজের মনে হয় যে স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা ও উচ্ছৃ-স্খলতা প্রভৃতি সমাজ-গঠন-বিরোধী বৃত্তির (anti-social quality) জন্যই আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে পারি না। সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ না করিতে পারার জন্য—কি সামাজিক ক্ষেত্রে, কি ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, কি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে—আমরা কোনও দিকে উন্নতি-লাভ করিতে পারিতেছি না। আমি চাই না যে আমাদের জাতীয় অধঃপতনের কারণ সম্বন্ধে আপনারা আমার অভিমত বিনা আলোচনায় গ্রহণ করেন। আমি বরং চাই যে আপনারা যেন সমস্ত জাতির ইতিহাস পাশাপাশি রাখিয়া আলোচনা করেন এবং ঐ আলোচনা হইতে আমাদের অধোগতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করেন। আমাদের চরিত্রের দোষগুলি সর্ব্বদা যদি চোখের সামনে ধরিয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলে সমস্ত জাতি সে বিষয়ে সাবধান হইয়া উঠিবে।

বিশ্বজগতের এবং মনুষ্যজীবনের ঘটনা পরম্পরায় অন্তরালে যে একটা অদৃশ্য নিয়ম নিহিত আছে—এ কথা আমরা অনেকে জানি না বা মনে রাখি না। পাশ্চাত্য মনীষীরা কিন্তু কোনও ঘটনাকে সহজে "আকস্মিক" বা "অদৃষ্টসম্ভূত" বা "দুর্দ্দৈব সঙ্ঘটিত" বলিয়া

গ্রহণ করিতে চাহেন না। প্রত্যেক জাতির আদর্শের চরণে নিজেকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে—ঐ আদর্শের অনুসরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে হইবে। আদর্শের চরণে আত্মবলিদান করিতে পারিলে—মানুষের চিন্তা ও কথা ও কার্য্য—এক সুরে বাঁধা হইবে; তাহার ভিতর-বাহির এক হইয়া যাইবে; তাহার সমস্ত জীবন এক আদর্শ সূত্রে গ্রথিত হইবে; সে তখন তাহার জীবনে নূতন রস, নূতন আনন্দ, নূতন অর্থ খুঁজিয়া পাইবে, সমগ্র বিশ্বজগৎ তাহার নিকট নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

আমি আজিকার এই অভিভাষণে ব্যক্তিগত সাধনার উপর বেশী জোর দিতেছি না। তার কারণ এই যে ভারতবাসী কোনও দিনই ব্যক্তিগত সাধন ভুলিয়া যায় নাই। ব্যক্তিত্ব-বিকাশের চেষ্টা আমরা কোনও দিনই ত্যাগ করি নাই। অবশ্য পাশ্চাত্য দেশের বা অন্যান্য দেশের ব্যক্তিত্বের আদর্শ এবং আমাদের দেশের ব্যক্তিত্বের আদর্শ এক নয়। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান পরাধীনতা ও সকল প্রকার দুর্দ্দশার মধ্যে যে আমাদের দেশে কত মহাপুরুষ জন্মাইয়াছেন এবং এখনও জন্মাইতেছেন তাহার একমাত্র কারণ এই যে খাঁটি মানুষ সৃষ্টির প্রচেষ্টা আমাদের জাতি কোনও দিন ভুলে নাই। কিন্তু আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম Collective sadhana বা সমষ্টিগত সাধনা; আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে জাতিকে বাদ দিয়া যে সাধনা—সে সাধনার কোন সার্থকতা নাই। তাই সমাজ-গঠন-বিরোধী বৃত্তি আমাদের মানসক্ষেত্রে

জন্মিয়াছে এবং ঐরূপ প্রতিষ্ঠান পরগাছার মত আমাদের জাতীয় জীবনকে ভারগ্রস্ত ও শক্তিহীন করিয়া তুলিয়াছে। আজ বাঙ্গলার তরুণ-সমাজকে রুদ্রের মত বলিতে হইবে—জাতি-সমাজ-গঠন-বিরোধী বৃত্তিনিচয় আমরা কুসংস্কারজ্ঞানে বিষবৎ পরিত্যাগ করিব এবং জাতি-সমাজ-গঠনের প্রতিকূল সমস্ত প্রতিষ্ঠান আমরা একেবারে নির্ম্মূল করিব।

ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্বন্ধে আমি আজ মাত্র একটা কথা বলিব। "সাধনা" বলিতে অনেকে অনেক রকম বুঝিয়া থাকেন এবং সাধনার বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যাও শুনিতে পাওয়া যায়। আমার ধারণা এই যে সাধনার উদ্দেশ্য মনুষ্যজীবনের রূপান্তর করা। রূপান্তর-সাধন করিতে হইলে বাহির হইতে চেষ্টা করিলে চলিবে না—মানুষের জীবন নূতন আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। আদর্শের চরণে নিজেকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে—ঐ আদর্শের অনুসরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে হইবে। আদর্শের চরণে আত্মবলিদান করিতে পারিলে—মানুষের চিন্তা, কথা ও কার্য্য—এক সুরে বাঁধা হইবে; তাহার ভিতর বাহির এক হইয়া যাইবে; তাহার সমস্ত জীবন এক আদর্শ-সূত্রে গ্রথিত হইবে; সে তখন তাহার জীবনে নূতন রস, নূতন আনন্দ, নূতন অর্থ খুঁজিয়া পাইবে। সমগ্র বিশ্বজগৎ তাহার নিকট নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

বর্ত্তমান যুগে যুগোপযোগী সাধনায় যদি প্রবৃত্ত হইতে হয় তাহা হইলে দেশাত্মবোধকেই জাতির আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

যাহা এই আদর্শের অনুকূল তাহা শ্রেয়স্কর বলিয়া গ্রহণীয় ; যাহা এই আদর্শের প্রতিকূল তাহা অনিষ্টকর বলিয়া পরিত্যজ্য।

নূতন আদর্শের উপর যদি জীবন গঠন করিতে হয় তাহা হইলে গতানুগতিক পন্থা পরিত্যাগ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য জাতি গতানুগতিক পন্থা বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বদা নূতনের সন্ধানে ছুটিতে পারে বলিয়া তাহারা এত উন্নতি করিতে পারিয়াছে। কিন্তু আমরা যেন "অজানার" ভয়ে সর্ব্বদা ভীত ; বাহির অপেক্ষা আমরা যেন ঘরকেই ভালবাসি ; তাই আমাদের spirit of adventure এত কম। কিন্তু এই spirit of adventure—যার এত অভাব আমাদের মধ্যে—সকল জাতির উন্নতির একটা প্রধান কারণ। আমি বাঙ্গলার তরুণ সমাজকে তাই বলিতে চাই—বাহিরের জন্য, "অজানার" জন্য পাগল হইতে শিখিতে হইবে। ঘরের কোণে অথবা দেশের কোণে লুকাইয়া থাকিলে চলিবে না। সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরিয়া নিজের চোখে দেখিতে হইবে এবং দেশ দেশান্তর হইতে জ্ঞানাহরণ করিয়া আনিতে হইবে।

আমাদের অসীম শক্তি আছে—নাই আমাদের আত্ম-বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। নিজের উপর, নিজের জাতির উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। দেশবাসীকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসিতে হইবে। মানুষ অন্তরের সহিত যাহা আকাঙ্ক্ষা করে তাহা একদিন পাইবেই পাইবে।

স্বাধীনতা লাভের জন্য আমরা যদি পাগল হইতে পারি তবেই আমাদের অন্তর্নিহিত অসীম শক্তির স্ফুরণ হইবে ; আমরা

নিজেরাই অবাক্ হইব এত শক্তি এত দিন কোথায় লুকাইয়া ছিল। এই নবজাগ্রত শক্তির বলে আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারিব।

জাতিকে যদি মুক্ত করিতে হয় তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে স্বাধীনতার আস্বাদ নিজের অন্তরে পাইতে হইবে। "আমি মুক্ত, স্বাধীন মানুষ"—এই কথা ধ্যান করিতে করিতে মানুষ সত্য সত্যই নির্ভীক হইয়া উঠে। নির্ভীক হইতে পারিলে মানুষ কোনও বন্ধনে আবদ্ধ হয় না; কোনও বাধাবিঘ্ন তাহার পথরোধ করিতে পারে না।

যশোহর-খুলনার ভ্রাতৃবৃন্দ—এস আমরা এক সঙ্গে বলি—"আমরা মানুষ হব; নির্ভীক, মুক্ত খাঁটি মানুষ হব। নূতন স্বাধীন ভারত আমরা ত্যাগ, সাধনা ও প্রচেষ্টার বলে গড়ে তুলব। আমাদের ভারতমাতা আবার রাজ-রাজেশ্বরী হবেন; তাঁর গৌরবে আমরা আবার গৌরবান্বিত হব। কোনও বাধা আমরা মানব না; কোনও ভয়ে আমরা ভীত হব না। আমরা নূতনের সন্ধানে, অজানার পশ্চাতে চল্‌ব। জাতির উদ্ধারের দায়িত্ব আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে, বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করব। ঐ ব্রত উদ্‌যাপন করে আমরা আমাদের জীবন ধন্য করব; ভারতবর্ষকে আবার বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসনে বসাব।" এসো ভাই! আমরা আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া শ্রদ্ধাবনত মস্তকে গললগ্নীকৃতবাসে মাতৃচরণে সমবেত হইয়া করজোড়ে বলি—"পূজার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ; অতএব জননী! জাগৃহি।"

[গত ২২শে জুন ১৯২৯ যশোহর-খুলনা যুব-সম্মিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ]

তিন

"সর্ব্বদেশে তরুণ সমাজ অসন্তুষ্ট ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা যাহা চায় তাহা পায় না; যে আদর্শকে ভালবাসে সে আদর্শ বাস্তবের মধ্যে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারে না। তাই তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে এবং যে মানুষ বা যে ব্যবস্থা তাহাদের কর্ম্মপথে অন্তরায় হইয়াছে তাহা অপসারিত করিবার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছে।"

*　　　　*

*

আজ আপনারা মেদিনীপুর জেলায় যুব-সম্মিলনীর আয়োজন করিয়াছেন এবং আমাকে সভাপতি পদে বরণ করিয়াছেন। আমিও সানন্দে আপনাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু এই সম্মিলনীর আয়োজন যখন আপনারা করেন, তখন কি একবার ভাবিয়াছিলেন কেন আপনারা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের পরিবর্ত্তে যুব-সম্মিলনী আহ্বান করিতেছেন? আজকাল দেশ-বিদেশে এত প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলন থাকিতে—যুব-আন্দোলন আবার আরম্ভ হইল কেন? ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা খুবই সহজ। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ, বয়োজ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দের উপর বীত-শ্রদ্ধ ভাব এবং নূতন কর্ম্মের ও নূতন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা—এই সব কারণের সংমিশ্রণের ফলে যুব-আন্দোলনের উৎপত্তি।

যুব-সমিতি গঠনের কাজে আজকাল অনেকে নিরত। কিন্তু যুব-আন্দোলনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপদ্ধতি বোঝেন কয় জন?

যুব-সমিতিকে সেবাসমিতির নামান্তর বলিয়া মনে করিলে চলিবে না। কংগ্রেস কমিটির নাম ও label বদলাইয়া যুব-সমিতি গঠন করিলেও চলিবে না। প্রকৃত পক্ষে যুব-আন্দোলন একটা স্বতন্ত্র আন্দোলন, ইহার বিশিষ্ট আদর্শ আছে—বিশিষ্ট কর্ম্ম প্রণালী আছে; সুতরাং কংগ্রেসের মধ্যে নেতৃত্ব বা মোড়লী করিবার আশা না থাকার দরুণ যাহারা অনন্যোপায় হইয়া যুব-আন্দোলনের পাণ্ডা সাজেন তাহাদের দ্বারা যুব-আন্দোলনের কোনও সেবা বা উন্নতি হইবে না। এবং চোখের সম্মুখে নূতন একটা আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া যাহারা স্থির থাকিতে না পারার দরুণ যুব-আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক হইয়া পড়েন তাহাদের দ্বারাও কোনও বড় কাজ হইবে না।

আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করিতেছি—বাঙ্গলার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলুন, এই আন্দোলনে কয়জন খাঁটি কর্ম্মী আছেন—যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া নিষ্কাম ভাবে এই কর্ম্মে যোগদান করিয়াছেন? অবশ্য যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য, অর্থ ও কর্ম্মপ্রণালী যতই প্রচারিত হইতেছে ততই আন্দোলন ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে। কিন্তু গোড়ায় একটী কথা বার বার বলা প্রয়োজন সেটা এই যে, যুব-সমিতি কংগ্রেসের বা সেবা-সমিতির শাখা-বিশেষ নয়। যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য—নূতনের সন্ধান আনা; নূতন সমাজ, নূতন রাষ্ট্র, নূতন অর্থনীতির প্রবর্ত্তন করা; মানুষের মধ্যে নূতন ও উচ্চতর আদর্শ

উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাকে মনুষ্যত্বের উচ্চতর সোপানে লইয়া যাওয়া। এই আকাঙ্ক্ষা যার মধ্যে জাগিয়াছে, যে ব্যক্তি নূতনের জন্য, মহত্তর জীবনের জন্য পাগল হইয়াছে—সে বর্ত্তমান ও বাস্তবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী না হইয়া পারে না। এই অশান্ত, অসন্তুষ্ট, বিদ্রোহী মন যার আছে—যে ব্যক্তি বর্ত্তমান ও বাস্তবের অবগুণ্ঠন সরাইয়া মহত্তর জীবনের দৃষ্টি ও আস্বাদ পাইয়াছে—সেই ব্যক্তি যুব-আন্দোলনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে এবং যুব-সমিতি গঠনের অধিকারী হইয়াছে।

পূর্ব্বেকার সব আন্দোলনের দ্বারা যদি আমাদের অন্তরের ক্ষুধা মিটিত এবং জাতীয় জীবনের সব প্রয়োজন সিদ্ধ হইত তাহা হইলে যুব আন্দোলন কোনও দিন জন্মিত না। কিন্তু দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতার দরুণই হউক অথবা প্রচেষ্টার অভাবের দরুণই হউক—তাহা হয় নাই। তরুণ প্রাণ বহুদিন যাবৎ অপরের স্কন্ধে আপনার ও আপনার জাতির সব দায়িত্ব চাপাইয়া যখন শেষে দেখিল—যে তাহার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল না, তখন সে আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। সব ক্লৈব্য ত্যাগ করিয়া সে তখন স্থির করিল, একবার সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে লইয়া দেখিব ফলাফল কি হয়। এ বিশ্বাস তাহার হইল যে কল্যাণকৃৎ কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হইবে না ("নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি") এবং সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্বাসও তাহার হইল যে ভরসা করিয়া এই ভার গ্রহণ করিলে পরিণাম কখনও অশুভ হইবে না; জয়লাভ করিলে সে বসুন্ধরা ভোগ করিতে পারিবে

এবং জয়ের পূর্ব্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে স্বর্গরাজ্যে স্থান পাইবে—
(হতো বা প্রাপস্যসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং) ।

যুব-আন্দোলন—যুবক-যুবতীদেরই আন্দোলন। এ আন্দোলন মানুষকে, মনুষ্য-সমাজকেও ও মনুষ্য-সভ্যতাকে জরা ও বার্দ্ধক্যের হাত থেকে রক্ষা করিতে চায় এবং মানুষের তারুণ্যকে অমর করিয়া রাখিতে চায়। প্রকৃতির বুকে যেরূপ evergreen পাদপ পাওয়া যায়—মানুষের প্রাণকেও তদ্রূপ নিত্য সবুজ করিয়া রাখা একান্ত প্রয়োজন। তাই যুগে যুগে তরুণের প্রাণ বার্দ্ধক্যের বিরুদ্ধে অনুকরণেচ্ছার বিরুদ্ধে, ভীরুতার বিরুদ্ধে, ক্লৈব্যের বিরুদ্ধে, অজ্ঞতার বিরুদ্ধে এবং সর্ব্বপ্রকার বন্ধনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। আমি গত বৎসর নাগপুরে তরুণদের একটি সভায় বলিয়াছিলাম—The voice of Krishna was the voice of immortal Youth—গীতার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের যে বাণীর ঝঙ্কার আমরা শুনিতে পাই, তাহা অমর তরুণাত্মারই বাণী।

যাঁহারা মনে করেন যে যুব-আন্দোলন সাগর পারের সামগ্রী—তার জন্ম ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং তার জন্মদাতা জার্ম্মানীর Karl Fisher (কার্ল ফিসার) তাঁহারা কিছুই জানেন না। এই পৃথিবীতে জরা বার্দ্ধক্য যত দিন আছে—যুব-আন্দোলনও ততদিন আছে। তবে বর্ত্তমান যুগে যুব-আন্দোলন বিরাট ও বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে এ বিষয় কোনও সন্দেহ নাই। যুব-আন্দোলনের পশ্চাতে একটা মহান্ আদর্শবাদ আছে। এ আদর্শবাদ নূতন হইলেও বহু পুরাতন; যুগে যুগে এই আদর্শবাদই মানুষের

প্রাণকে সঞ্জীবনী সুধায় ভরপুর করিয়া নূতন জীবন ও নূতন শক্তি দান করিয়াছে। অতি প্রাচীন কালে আমাদের এই দেশে মানুষ "ধর্ম্ম-রাজ্যের" স্বপ্ন দেখিত। মানুষ তখন চাইত—তখনকার সমাজ ও রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া "ধর্ম্ম-রাজ্য" স্থাপন করিতে। প্রাচীন কালে গ্রীস্-দেশে সেখানকার ঋষিরা স্বপ্ন দেখিত—Ideal Republicএর আদর্শ প্রজাতন্ত্রমূলক সমাজের। তারপর যুগের পর যুগ কত দেশে কত মণীষী কত Utopiaর স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছেন। কেহ লিখিতেছেন new ageএর (নূতন যুগের) কথা—কেহ লিখিতেছেন great societyর (বৃহত্তর সমাজের) কথা—কেহ লিখিতেছেন millenium এর কথা—কেহ লিখিতেছেন অনাগত সত্য যুগের কথা—কেহ লিখিতেছেন Socialist State (সাম্যবাদমূলক রাষ্ট্রের) কথা। নানা দিক দিয়া, নানা ভাবে, নানা রূপের মধ্যে তরুণের প্রাণ যুগের পর যুগ একটা আদর্শ-সমাজের এবং আদর্শ-মানুষের স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছে এবং সাধ্যমত তাহা বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান যুগে কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে আমরা Superman (অতিমানুষ) এর কথা শুনিতে পাই। Supermanএর মতবাদ অনেকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা উপহাস করিবার বিষয় নয়—কারণ ইহার মধ্যে একটা মহান্ সত্য নিহিত আছে। Supermanএর যে রূপ জার্ম্মাণ দার্শনিক Nietsche (নীট্‌স্) দিয়াছেন অথবা ভারতের কোনও মনীষী দিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আপনারা অখণ্ড সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিতে পারেন—কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য যে সাধু

ও মনুষ্য-জাতির পক্ষে কল্যাণকর এবং তাঁদের প্রচেষ্টা যে প্রশংসনীয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যে জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ superman এর (অতিমানুষের) স্বপ্ন দেখেন না—সে জাতির কি Idealism বা আদর্শবাদ আছে? এবং যে জাতির আদর্শবাদ নাই সে জাতি কি জীবন্ত—সে জাতি কি মহত্তর সৃষ্টির অধিকারী হইতে পারে?

মানুষের সমস্ত প্রাণ যদি উদ্বুদ্ধ করিতে হয়—তাহার প্রত্যেক রক্তবিন্দুর মধ্যে যদি মৃতসঞ্জীবনী সুধা ঢালিতে হয়—তাহার অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তির স্ফুরণ যদি ঘটাইতে হয়—তাহা হইলে একটা মহত্তর আদর্শের আস্বাদ তাহাকে দেওয়া চাই। খ্রীষ্টীয়দের "বাইবেলে"এ (Bible) একটা কথা আছে—men do not live by bread alone—শুধু উদর পূরণের দ্বারা মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তার জীবনধারণের জন্য অন্যরকম খোরাকেরও প্রয়োজন আছে। মানুষ জানিতে চায় তার জীবনের উদ্দেশ্য—সে কেন বাঁচিয়া আছে—তার জীবন ধারণের সার্থকতা কিসে। এ প্রশ্নের উত্তর সে যদি ঠিকমত না পায়—তাহা হইলে সে জীবনের শক্তি পায় না—নিজের জীবন ব্যর্থ বলিয়া মনে করে—এবং অন্তরের সব শক্তির উন্মেষ সাধন করিতে পারে না। কিন্তু এ আদর্শের অনুভূতি ও আস্বাদ জোর করিয়া কেহ দিতে পারে না। অনুভূতি ও আস্বাদ নিজে যে পায় নাই—সে অপরকে তাহা কি করিয়া দিবে?

স্বপ্ন অনেক ছিল, অনেকের আছে। আমাদের স্বর্গীয় নেতা

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়েরও একটা স্বপ্ন ছিল। সে স্বপ্ন ছিল তাঁর শক্তির উৎস; তাঁর আনন্দের নির্ঝর। তাঁর স্বপ্নের উত্তরাধিকারী আজ আমরা হইয়াছি। আমাদেরও তাই একটা স্বপ্ন আছে; এই স্বপ্নের প্রেরণায় আমরা উঠি, বসি, চলা-ফেরা করি, ও লিখি ও বলি এবং কাজকর্ম্ম করি। সে স্বপ্ন বা আদর্শ কি? আমি চাই একটা নূতন সর্ব্বাঙ্গীন-মুক্তি সম্পন্ন সমাজ এবং তার উপরে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র; যে সমাজে ব্যক্তি সর্ব্বভাবে মুক্ত হইবে এবং সমাজের চাপে আর নিষ্পিষ্ট হইবে না—সে সমাজে জাতিভেদের অচলায়ন আর থাকিবে না—যে সমাজে নারী মুক্ত হইয়া, সমাজে এবং রাষ্ট্রে, পুরুষের সহিত সমান অধিকার ভোগ করিবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবায় সমান ভাবে আত্মনিয়োগ করিবে, যে সমাজে অর্থের বৈষম্য থাকিবে না, যে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি শিক্ষা ও উন্নতির সমান সুযোগ পাইবে, যে সমাজে শ্রমের এবং কর্ম্মের পূর্ণ মর্য্যাদা থাকিবে এবং অলসের ও নিষ্কর্ম্মার কোনও স্থান থাকিবে না; যে রাষ্ট্র বিজাতীয় প্রভাব প্রতিপত্তির হস্ত হইতে সর্ব্ব-বিষয়ে মুক্ত হইবে, যে রাষ্ট্র আমাদের স্বদেশী সমাজের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া কাজ করিবে, সর্ব্বোপরি যে সমাজ ও রাষ্ট্র ভারতবাসীর অভাব মোচন করিয়া বা ভারতবাসীর আদর্শ সার্থক করিয়া ক্ষান্ত হইবে না পরন্তু বিশ্বমানবের নিকট আদর্শ সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্র বলিয়া প্রতিভাত হইবে—আমি সেই সমাজ ও সেই রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়া থাকি। এই স্বপ্ন আমার নিকট নিত্য এবং অখণ্ড সত্য; এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সব কিছু

করা যায়; সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ বরণ করা যায়; সর্ব্বপ্রকার কষ্ট স্বীকার করা যায় এবং এই স্বপ্ন সার্থক করিবার চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেও "সে মরণ স্বরগ-সমান।" হে তরুণ ভ্রাতৃমণ্ডলী। তোমাদের দিবার মত সম্পদ আমার কিছু নাই—আছে শুধু এই স্বপ্ন—যাহা আমাকে অসীম শক্তি ও অপার আনন্দ দিয়াছে, যাহা আমার ক্ষুদ্র জীবনকেও স্বার্থক করিয়াছে। এই স্বপ্ন আমি তোমাদের উপহার-স্বরূপ দিতেছি—গ্রহণ কর।

আজকাল রাজনীতি ক্ষেত্রে আমরা অনেক প্রকার গালাগালি ও অনেক মজার সমালোচনা শুনিতে পাই—তার মধ্যে একটা অভিযোগ এই যে, আমরা নাকি "যুব সমিতি" গুলি Capture বা দখল করিবার চেষ্টা করিতেছি। এ অভিযোগ শুনিয়া হাসি পায়। যাহারা কোনও প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের সহায়তা করিয়া আসিতেছে—তাহাদের বিরুদ্ধে Capture অভিযোগ হাস্যাস্পদ বটে। আমি জিজ্ঞাসা করি, যুব-সমিতির ও ছাত্র আন্দোলনের এই নবাগত বন্ধুরা এতদিন কোথায় ছিলেন? যাহারা গোড়া হইতে এই আন্দোলনের সৃষ্টি ও ক্রমোন্নতির সহায়তা করিয়া আসিতেছে তাহারা আজ Capture-অপরাধে অপরাধী এবং যাহারা প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত কিছুই করেন নাই এবং এখন Capture করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন—তাহারা হইলেন নিঃস্বার্থ হিতৈষী! গত কলিকাতা কংগ্রেসের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রসমিতির সাধারণ সভায় আমি এই বৎসরের জন্য আমাদের কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্দেশ করি। সেই বিস্তৃত কর্ম্মপদ্ধতির

মধ্যে একটী বিষয়ের উল্লেখ ছিল—"To assist students' movement, youth movement and physical culture movement"—অর্থাৎ "ছাত্র-আন্দোলন, যুব-আন্দোলন ও ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিতে হইবে।" এই কর্ম্মপদ্ধতি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক জেলা কংগ্রেস কমিটির নিকট পাঠানো হইয়াছিল। তখন কোনও আপত্তি শোনা যায় নাই ; বরং সকলে অনুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু বৎসর শেষে যখন দলের স্বার্থপোষণের জন্য অপরকে গালাগালি দেওয়া দরকার হইল, তখন এই অভিযোগ আবিষ্কৃত হইল যে, আমরা নাকি যুব-সমিতিগুলি অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছি ! আমাদের যদি কোনও অপরাধ হইয়া থাকে তাহা এই যে আমরা যুব-আন্দোলনের যথেষ্ট সেবা ও সহায়তা করি নাই ! ফলে নিখিল বঙ্গীয় যুবসমিতি নামে যে প্রতিষ্ঠান আছে তাহা দিন দিন নিষ্কর্ম্মা হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গলার অনেক জেলায় স্থানীয় যুব-সমিতিগুলি যথেষ্ট কাজ করিতেছে, কিন্তু যাহারা এই যুব-আন্দোলনের কর্ণধার বলিয়া পরিচয় দেন—সেই নিখিল বঙ্গীয় যুব-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষেরা —এ কয় বৎসর যাবৎ কি করিলেন? বঙ্গীয় যুব-সমিতির মধ্যে কেহ কেহ অবশ্য যুব-আন্দোলনের বিষয়ে অনেক প্রোপাগাণ্ডা (propaganda) করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার এই উক্তি প্রযোজ্য নয়। কিন্তু অধিকাংশ সভ্যেরা কি করিয়াছেন ? কোনও কোনও প্রদেশে সেখানকার প্রাদেশিক যুব-সমিতি খুব কর্ম্মঠ ও উৎসাহ-পরায়ণ, কিন্তু বাঙ্গলাদেশে যুব-আন্দোলনের

উৎসের মুখে যেন বাধা পড়িয়াছে। এবং এই উৎস হইতে মধ্যে মধ্যে যে বাণী নির্গত হয় তাহা অনেক সময়ে কংগ্রেসের অথবা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বিরোধী।

আর একপ্রকার সমালোচনা আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই—আমরা না কি অপরকে কাজ করিবার সুযোগ দিই না। কাজ করিবার সুযোগ কে কাকে দেয়? আমাদেরই বা কাজ করিবার সুযোগ কে দিয়াছে? যার ভিতরে মনুষ্যত্ব আছে সে নিজ শক্তি বলে কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া লয়; মাতা যেরূপ শিশুর মুখে অন্ন তুলিয়া দেন তার জন্য সেরূপ কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া দিতে হয় না। কিন্তু আমরা সময়ে সময়ে রাজনৈতিক নাবালক সাজিয়া বলি যে আমরা কাজ করিবার সুযোগ পাইতেছি না—আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র কেহ আমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়া দিতেছে না। যে ব্যক্তি ক্রমাগত অভিযোগ করে যে, সে কাজ করিবার সুযোগ অথবা কর্ম্মক্ষেত্র পাইতেছে না—সে কস্মিন্ কালেও তাহা পাইবে না। এবং যে ব্যক্তি অভিযোগ না করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় তাহার সুযোগ বা কর্ম্মক্ষেত্রের অভাব কোনও দিন হয় না। বাঙ্গলার যুব-আন্দোলনের কর্ণধাররূপে যাঁহারা গত কয়েক বৎসর যাবৎ দায়িত্ব লইয়া বসিয়া আছেন তাঁহারাও কি কাজ করিবার সুযোগ, সুবিধা ও কর্ম্মক্ষেত্র পান নাই?

বাঙ্গলা দেশে আজকাল তুমুল বাদ-বিসম্বাদ, জোটাজুটি ও ঝগড়া বিবাদ লাগিয়াছে। বর্ত্তমান দলাদলি যে নিতান্ত শোচনীয় ব্যাপার সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই দলাদলিতে

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভুগিয়া থাকি আমরা, কারণ সহানুভূতির জন্য, অর্থ সাহায্যের জন্য, আমাদের বার বার জনসাধারণের দারস্থ হইতে হয়। ঝগড়া বিবাদ থাকিলে আমরা সাধারণের নিকট সহানুভূতি পাই না—অর্থ তো পাই-ই না—পাই শুধু অনাবিল গালাগালি। বিবাদ কলহ যতদিন চলিবে ততদিন আমাদের কাজকর্ম্ম এক-রকম বন্ধ থাকিবে—একথা অত্যুক্তি নয়। সুতরাং বিবাদ মিটাইবার আগ্রহ আমাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অথচ কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, আমাদের পেশা বুঝি ঝগড়া করা এবং আমরা কাজকর্ম্ম ফেলিয়া ইচ্ছা করিয়াই কোমর বাঁধিয়াছি ঝগড়া করিতে। কংগ্রেস একটা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান—কংগ্রেস social service League-এর নামান্তর নহে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন লোকেব আদর্শ থাকা স্বাভাবিক এবং কর্ম্ম-পদ্ধতি-সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত থাকা অনিবার্য্য। মত ভিন্ন হইলে অনেক সময়ে পথও ভিন্ন হইয়া থাকে। অতএব ব্যক্তিগত ঝগড়া না থাকিলেও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মতানৈক্য প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। মতান্তর অনেক সময়ে মনান্তরে পরিণত হয় এবং তার উপর যখন ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে তখন দলাদলি আরও তিক্ত ও বিষাক্ত হইয়া উঠে। কিন্তু দলাদলির জন্য প্রকৃত পক্ষে কে দায়ী তাহা অনুসন্ধান না করিয়া কাহারও উপর দোষারোপ করা ঠিক নয়—ঝগড়া বিবাদের জন্য যাহারা দায়ী নয়—তাহাদের অনর্থক বদ্‌নামের ভাগী করা কাহারও উচিত নয়। রাজনীতিক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে মতান্তর হওয়া অনিবার্য্য এবং

মতান্তরের জন্য ঝগড়া বিবাদ হওয়াও বোধ হয় তদ্রূপ অনিবার্য্য। কিন্তু মতান্তর যেন মনান্তরে পরিণত না হয় এবং ব্যক্তিগত নিন্দা ও গালাগালি যেন আমাদের অস্ত্র না হইয়া দাঁড়ায়—এ বিষয়ে আমাদের সাবধান ও সতর্ক হওয়া উচিত। তারপর গণ-আন্দোলনে যোগদান করিয়া আমরা যদি এতটা অসহিষ্ণু হইয়া পড়ি যে, ভোটের পরিবর্ত্তে লাঠি ও ছোরা ব্যবহার করিতে আমরা দ্বিধা বোধ করি না তাহা হইলে দেশের তুর্দ্দিন আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। সেদিন কলিকাতায় এক ছাত্র-সভার কাজ পণ্ড করিবার জন্য বাহিরের লোক ও কতিপয় ছাত্র যেরূপ ভাবে আসিয়া আক্রমণ করিয়াছিল তাহা অতীব নিন্দনীয়। তার পূর্ব্বে চট্টগ্রামে যে শোচনীয় তুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, যার ফলে শ্রীমান্ সুখেন্দুবিকাশ দত্তের মত চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের আদর্শ বালককে নিজের জীবন দিতে হইল—তাহা ভুলিবার নয়। এসব গুণ্ডামির জন্য দায়ী কে, তাহা আমাদের অনুসন্ধান করা উচিত। এবং অনুসন্ধানের পর আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করা উচিত। যেখানে এরূপ পাশবিকতা দেখা দিয়াছে সেখানে একতার নামে এ সব ব্যাপারে ধামাচাপা দিয়া কোনও লাভ নাই। সমাজের দেহে গলদ যাহা আছে, তাহা শোধন করিয়া ফেলা উচিৎ।

তুঃখের বিষয় এই যে, যাহারা গুণ্ডামির আশ্রয় লয়—তাহারা একবার ভাবিয়াও দেখে না যে ইহার পরিণাম কি। প্রথমতঃ যে ব্যক্তি অপরের উপর গুণ্ডামি করে তার জানা উচিত যে একদিন তাহার উপরও গুণ্ডামি হইতে পারে কারণ সব মানুষ সমানভাবে

সহিষ্ণু ও অসিংহ নয়। তার পর আর একটা কথা তার মনে রাখা উচিত যে, দেশের জনসাধারণ এ গুণ্ডামি অনুমোদন করে না—সুতরাং গুণ্ডামি যে করিবে সে যে সাধারণের সহানুভূতি ও ভালবাসা হারাইবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং গুণ্ডামি আপনাকেই ব্যর্থ করিয়া থাকে।

আজকাল যুব আন্দোলন সম্বন্ধে যত লেখা বাহির হয় তার মধ্যে কখনও কখনও কেবল সমালোচনাই পাওয়া যায়—পথ নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। ফলে, তরুণ-সমাজের মধ্যে একটা অর্থহীন বিশৃঙ্খলায় ভাব যেন আসিয়া পড়িয়াছে। মানুষ সবের মধ্যে কেবল দোষ এবং খুঁত দেখিতে শেখে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট কোনও নির্দ্দেশ পায় না—কোন্ পথে চলা উচিত বা কাহাকে অনুসরণ করা উচিত। এ সম্পর্কে 'দাদা কোম্পানীর' খুব উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমি নিজে এই কোম্পানীর সভ্য কোনও দিন ছিলাম না—আশা করি কোনও দিন হইব না। কিন্তু আমি বুঝিতে পারি না যে, যাহারা একদিন এই কোম্পানীর সভ্য ছিলেন তাহারা কেন দাদা কোম্পানীর প্রতি এত বিরূপ হইয়াছেন? তাঁদের নিজেদের প্রতি কোম্পানী এখন Liquidation এ গেছে অথবা তাঁরা এখন promotion লাভ করিয়া ঠাকুর-দাদার সোপানে উঠিয়াছেন—ইহাই কি তাঁহাদের অসন্তোষের কারণ? তাহা যদি হয় তবে তার জন্য দায়ী কে?

আজ বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে দলাদলি ভীষণ আকারে দেখা দিয়াছে—ইহাতে দুঃখিত ও ব্যথিত হয় নাই এমন মানুষ

বাঙ্গালাদেশে নাই। যদি কেহ থাকেও তবে সে মনুষ্যপদবাচ্য নয়। কিন্তু ইহাতে হতাশ হইবার কোনও কারণ আমি দেখি না। আমার গত ৮।৯ বৎসরের অভিজ্ঞতার ভিতরে তৃতীয়বার এই দলাদলি বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয়-গগণ কালিমাময় করিয়া তুলিয়াছে। প্রথম ধাক্কা স্বয়ং দেশবন্ধুকে খাইতে হইয়াছিল; আমরা অবশ্য তাঁর পার্শ্বে ও পশ্চাতে ছিলাম এবং ধাক্কা খানিকটা আমাদের গায়েও লাগিয়াছিল। তখন শুনিতে হইয়াছিল দেশবন্ধুর শত্রুপক্ষের মুখে, যে মাসিক ৫০০০০৲ টাকার আয় পরিত্যাগ করিয়া তিনি পাঁচ হাজারি মন্ত্রীত্ব গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন; এবং এ কথাও শুনিতে হইয়াছিল যে চিত্তরঞ্জনকে তাঁহারা দেশছাড়া করিবেন। দেশছাড়া তাঁহারা চিত্তরঞ্জনকে করিয়াছেন এ বিষয় সন্দেহ নাই—কারণ দেশবাসীর সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে তাঁহাকে অকালে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইল।

দ্বিতীয় ধাক্কা খাইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবর্গ। তখন আমরা অনেকে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বহুদূরে; কিন্তু প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়া আমরা যে ফলাফলের জন্য অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিলাম এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ফলে কংগ্রেসের জয় হইল। এবার তৃতীয় ধাক্কা আমরা নিজেরা সামনা-সামনি ভাবে খাইতেছি। ফল যে পূর্ব্ববৎ হইবে এবং কংগ্রেসের জয় যে অবশ্যম্ভাবী সে বিষয় কোনও সন্দেহ নাই। তবে দুঃখের বিষয় এই যে বিরোধের মীমাংসা ইহার পূর্ব্বে অনেক গালাগালি আমাদের খাইতেই হইবে এবং অনেক কষ্ট আমাদের সহিতে হইবে।

এই বিরোধের মূলে যদি তৃতীয় পক্ষের কোনও হাত না থাকিত তাহা হইলে আমরা এত কষ্ট পাইতাম না।

আর একটা তীব্র সমালোচনা মধ্যে মধ্যে আমাদের কাণে আসে—সেটা এই যে কংগ্রেস এতদিন ঝগড়া বিবাদ ছাড়া আর কি করিল? আমাদের দেশে যাঁহারা political minded—যাঁহাদের রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি আছে—তাঁহারা কিন্তু এ প্রশ্ন করেন না। এই প্রশ্ন করেন তাঁহারা, যাঁহারা মনে করেন যে দেশসেবার একমাত্র উদ্দেশ্য—হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করা, সেবা সমিতি গঠন করা এবং বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সময়ে আর্ত্তের সেবা করা। তাঁহারা হাঁসপাতালের জন্য ১ লক্ষ টাকা দিবেন কিন্তু স্বরাজ-লাভের জন্য ১৩০৲ টাকাও সানন্দে দিবেন না। তাঁহারা বলেন ওমুক হাঁসপাতালের এতগুলি bed হইয়াছে, এতগুলি রোগীর চিকিৎসার আয়োজন হইয়াছে—কিন্তু তোমাদের কংগ্রেসে কি হইয়াছে? এরূপ প্রশ্ন শুনিলে কাহার ক্ষমতা আছে যে তাঁহাদের বুঝাইতে পারে যে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সকল রোগের মূলে যে মহাব্যাধি (—যে মহাব্যাধির বিরাম না হইলে অন্য কোনও রোগ. নির্ম্মূল হইতে পারে না) সেই মহাব্যাধি নিরাকরণ করা? আমাদের যাবতীয় দুর্দ্দশার মূল কারণ যদি আমাদের পরাধীনতা হয় তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত আমরা পরাধীনতা ঘুচাইতে না পারিব। সে পর্য্যন্ত আমরা সুস্থ, সবল ও কর্ম্মঠ জাতি হইতে পারিব না। অতএব আমাদের সমস্ত শক্তি, উদ্যম, সম্পাদ ও সময় স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যয় করা উচিত। কিন্তু মুস্কিল এই যে আমরা শক্তি ও সম্পাদ ব্যয়

করিয়া স্বাধীনতার পথে কতদূর অগ্রসর হইতে পারিলাম তাহা বাহিরের কোনও মাপকাঠির দ্বারা অপরকে বুঝান যায় না। হাঁসপাতালের বা বিদ্যালয়ের উন্নতি যত সহজে অপরকে বুঝান যায়, রাষ্ট্রীয় উন্নতির কথা সেভাবে বুঝানো যায় না—তাই বিস্ময়াত্মিকা বুদ্ধি যাঁহাদের, তাহারা মনে করেন যে আমরা, স্বরাজীরা, কেবল অর্থের অপব্যয় করি এবং বাজে কাজে সময় নষ্ট করিয়া থাকি। জাতির মধ্যে আদর্শবাদ আরও সঞ্চারিত না হইলে রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি জাগিবে না—রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি না জাগিলে রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের অর্থ তাঁহারা বুঝিবেন না—রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের সার্থকতা উপলব্ধি না করিলে তাহারা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য অকাতরে অর্থ ও সময় ব্যয় করিবেন না এবং সর্ব্বস্ব পণ করিতে না পারিলে জানি কোনও দিন স্বাধীন হইবে না।

তাই আমার অনেক সময়ে মনে হয় যে আমাদের দেশবাসীর মধ্যে political mentalityর বড়ই অভাব। এই রাষ্ট্রীয় মনোভাব বা রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি সৃষ্টি করাই কংগ্রেসের অন্যতম উদ্দেশ্য। জাতির মধ্যে সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম বিচার শক্তি না আসিলে সে জাতি বহু বৎসর ধরিয়া সর্ব্বস্ব বিলাইয়া আদর্শের পশ্চাতে ছুটিবার সামর্থ্য পাইবে না। এই বুদ্ধি ও বিচারশক্তি আনিবার একমাত্র উপায়, সেই জাতির মধ্যে আদর্শবাদ সঞ্চার করা। এই আদর্শবাদ সঞ্চার করিতে হইলে জাতির প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে আঘাত করিতে হইবে—তাহার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা—আত্মবিকাশের স্পৃহা জাগাইতে হইবে। স্বাধীনতার জন্য তীব্র ক্ষুধা জাগিলে সে জাতি

তখন জীবনপণ করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। আপ্রাণ চেষ্টা ও ব্যাকুল সাধনা জাতি যেদিন করিতে পারিবে, জাতি সেদিন মুক্ত হইবে।

জনৈক বন্ধু আমাকে সেদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—গত দুই বৎসর ধরিয়া আপনি কি করিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে একটু তুলনা করা দরকার গত দুই বৎসরের আগের দুই বৎসর কি হইয়াছিল এবং গত দুই বৎসর অন্য প্রদেশেই বা কি কাজ হইয়াছে। গত দুই বৎসর বেশী কাজ হউক আর না হউক—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহা যদি ভারতবর্ষে কোথাও থাকে তবে আছে বাঙ্গলায় ও পাঞ্জাবে। এবং গত দুই বৎসর বাঙ্গলাদেশে জোরের সঙ্গে একটা আন্দোলন যদি না চলিয়া থাকিত তাহা হইলে আজ বাঙ্গালী সরকার বাহাদুরের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না।

তথাপি এ কথা কৈফিয়ত স্বরূপ আমি বলিতে চাই না যে আমরা গত দুই বৎসর যাহা করিয়াছি তার জন্য আমরা খুব প্রসংসার্হ। আমি শুধু বলিতে চাই এই কথা যে, যে-অবস্থায় আমরা কংগ্রেস হাতে লইয়াছিলাম তাহা বিবেচনা করিলে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থায় কথা চিন্তা করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে আমরা সাধ্যমত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। ১৯২৭ সালে বাঙ্গলার কংগ্রেস কমিটীর অবস্থা ছিল ভাঙ্গা-হাটের মত। একে সমগ্র ভারতবর্ষে তখন অসহযোগের স্রোতে ভাঁটা

পড়িয়াছে—তার উপর আবার বাঙ্গলা দেশে ভীষণ দলাদলির ফলে তখন কংগ্রেস কমিটি নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে। দেশের বহু কর্ম্মী তখনও কারারুদ্ধ। এই দুর্য্যোগের মধ্যে আমরা অবতীর্ণ হই এবং ধীরে ধীরে আবার উৎসাহ ও শক্তি সঞ্চার করিবার চেষ্টা করি।

আমরা আজ যে যুগসন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আছি সে অবস্থায় যদি কাহাকেও কংগ্রেসের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়, তবে একদিকে তাহাকে জোড়াতালি দিয়া পুরাণ প্রোগ্র্যাম অনুসারে কাজ করিয়া যাইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য এবং ভবিষ্যতের সংগ্রামের জন্য দেশকে প্রস্তুত করিয়া যাইতে হইবে। যে প্রোগ্র্যাম লইয়া ১৯২১ সাল হইতে এতদিন আমরা চলিয়াছি, সে প্রোগ্র্যাম যথেষ্ট নয়। আমরা এ কয় বৎসরের চেষ্টার ফলে যত লোকের অন্তরে জাতীয় ভাব উদ্বুদ্ধ করিতে পারিয়াছি, তাহাও যথেষ্ট নয়। এখন আমরা নূতন প্রোগ্র্যাম চাই—কিন্তু নূতন প্রোগ্র্যাম চাইবার পূর্ব্বে চাই নূতন মানুষ—যাহারা নূতন প্রোগ্র্যাম গ্রহণ করিতে পারিবে। এখনকার কংগ্রেসে অপনি নূতন প্রোগ্র্যাম লইয়া যান—কেহ তাহা গ্রহণ করিবে না—গ্রহণ করিলেও তাহা কাজে লাগাইবে না—অর্থাৎ অন্তরের সহিত গ্রহণ করিবে না। আমাদের মধ্যে একদল লোক আছেন যাহারা "প্রোগ্র্যাম, প্রোগ্র্যাম" বলিয়া কেবল চীৎকার করেন কিন্তু তাঁহারা তলাইয়া দেখেন না যে নূতন মানুষ তৈয়ার না করিলে সে প্রোগ্র্যামের মূল্য বুঝিবে কে?

১৯২৭ সাল হইতে এই প্রশ্নই আমার চিত্তকে আলোড়িত করিয়া আসিতেছে। নূতন প্রোগ্রাম আমারও একটা আছে—কিন্তু সে প্রোগ্রাম দিবার সময় এখনও আসে নাই—আসিবে সেইদিন, যেদিন নূতন মানুষ প্রস্তুত হইবে, যাহারা কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করিয়া তাহা কাজে লাগাইতে পারিবে। নূতন মানুষ তৈয়ারী করিবার চেষ্টায় আমি এখন নিরত। তাই গত দুই বৎসর ধরিয়া আমি ছাত্র আন্দোলন, যুব-আন্দোলন, নারী আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ে এত জোর দিয়া বলিয়া আসিতেছি। এই সব আন্দোলনের সাহায্যে যদি নূতন মানুষ—পুরুষ ও নারী—প্রস্তুত হয়, তখন নূতন প্রোগ্রাম দিলে তার সার্থকতা হইবে।

এই সব আন্দোলনের ভিতর প্রাণ সঞ্চার করিতে হইলে নূতন আদর্শ চাই। আমার আদর্শ—দেশের ও সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি। সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তির বাণী গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ঘরে ঘরে প্রচার করিতে হইবে। স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। স্বাধীনতার অখণ্ড রূপ আমরা অনেকেই আজও উপলব্ধি করি নাই। অখণ্ডরূপের উপলব্ধি জাতির মানস ক্ষেত্রে একদিনে আসে না। বহুদিনের সাধনার ফলে এবং বহু বৎসর খণ্ড খণ্ড রূপ দেখিবার পর আমরা আজ অখণ্ড-রূপের উপলব্ধি পাইতেছি। সমগ্র জাতিকে এখন বুঝাইয়া দিতে হইবে স্বাধীনতার অখণ্ড রূপ কি। যে দিন জাতি এই অখণ্ড রূপের উপলব্ধি লাভ করিবে সেই দিন জাতি পূর্ণভাবে মুক্ত হইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিবে।

পূর্ণ সাম্যবাদের উপর নূতন সমাজকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। জাতিভেদের অচল আয়তনকে একেবারে ধূলিসাৎ করিতে হইবে; নারীকে সর্ব্বভাবে মুক্ত করিয়া সমাজে ও রাষ্ট্রে পুরুষের সহিত সমান অধিকার ও দায়িত্ব প্রদান করিতে হইবে; অর্থের বৈষম্য দূর করিতে হইবে এবং বর্ণ-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকে (কি পুরুষ কি নারী) যাহাতে শিক্ষার ও উন্নতির সমান সুযোগ ও সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমাজতন্ত্রমূলক সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র যাহাতে স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।

এক কথায় আমরা চাই ভারতের পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা। এই নূতন স্বাধীন ভারতে যাহারা জন্মিবে তাহারা মানুষ বলিয়া জগৎ সভায় পরিগণিত হইবে। ভারত আবার জ্ঞানে, বিজ্ঞানে—ধর্ম্মে কর্ম্মে—শিক্ষায় দীক্ষায়—শৌর্য্যে বীর্য্যে জগৎ-বরেণ্য হইবে।

আমাদের কর্ত্তব্য কি তাহা আর খুলিয়া বলার প্রয়োজন নাই। আমরাই তো নূতন ভারতের স্রষ্টা। অতএব এসো আমরা সকলে মিলিয়া এই পবিত্র মাতৃযজ্ঞে যোগদান করি। মা আমাদের আবার রাজরাজেশ্বরীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইবেন। এখনকার কাঙ্গালিনী মাকে ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্না দশভুজারূপি দেখিয়া আমাদের চক্ষু সার্থক হইবে, জীবন ধন্য হইবে। অতএব এসো ভ্রাতৃবৃন্দ! আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া সর্ব্বস্ব বলিদানের জন্য মাতৃচরণে সমবেত হই!

[বিগত ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৯, মেদিনীপুর যুব-সম্মিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।]

চার

"মনে রাখিবেন আমাদের সমবেত চেষ্টায় ভারতবর্ষে নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের সমাজে ওতঃপ্রোতঃভাবে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে ধনেপ্রাণে মারিতে চেষ্টা করিতেছে। আমাদের ব্যবসায় বাণিজ্য, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, শিল্পকলা মরিতে বসিয়াছে। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে আবার মৃত-সঞ্জীবনী সুধা ঢালিতে হইবে। এই সুধা কে আহরণ করিয়া আনিবে?"

*　　　　*

*

হে আমার তরুণ ভাই ও ভগিনী সকল! আপনারা আমাকে এই তরুণ পরিষদের সভাপতি-পদে বরণ করিয়া যে প্রীতির নিদর্শন দেখাইয়াছেন তার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আজ পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এই বিশ্বব্যাপী জাগরণের প্রভাবে আমরাও আজ এখানে সমবেত হইয়া জীবনের সমস্যা সমাধানে ব্রতী হইয়াছি।

প্রায় আড়াই বৎসর পরে কারার প্রাচীরের বাহিরে যখন পদার্পণ করি, তখন দেশের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে এই কথাই মনে হইয়াছিল যে কতকগুলি দুর্ঘটনা ও দুর্দ্দৈব বশতঃ আমরা যেন আপাততঃ বড় কথা ভাবিবার এবং দূরের বস্তু দেখিবার ক্ষমতা হারাইয়াছি। ইহার ফলে আমাদের সমাজে নীচ চিন্তা, ক্ষুদ্র স্বার্থ ও পরস্পরের মধ্যে দলাদলি দেখা দিয়াছে, আমরা অসত্যকে সত্য

মনে করিয়া, আসলকে ছাড়িয়া ছায়ার পশ্চাতে ছুটিয়াছি। কিন্তু সুখের বিষয়, আমাদের এই সাময়িক মোহ ভাঙ্গিতেছে; আমরা আমাদের সহজ দৃষ্টি ফিরিয়া পাইতেছি। তরুণের হৃদয়ে আবার আত্ম-প্রত্যয় জন্মিতেছে। সে বুঝিতেছে—জীবনে তাহার উপর কত বড় দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে; সে উপলব্ধি করিতেছে যে ভবিষ্যৎ সমাজ গড়িয়া তোলার ভার তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। শুধু তাহাই নয়, আমাদের তরুণ-সমাজ আজ নিজের অন্তরে অনন্ত শক্তির সন্ধান পাইতেছে! সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে যে মৃত্যুঞ্জয় তরুণ-শক্তি মুক্তির ইতিহাস রচনা করিয়াছে, আমাদের দেশে আজ সেই তরুণশক্তিই নিজের অস্থিদান করিয়া বজ্র নির্ম্মাণের সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেছে।

আমাদের জাতীয় সমস্যা বিষয়ে আমার বক্তব্য অনেক আছে। একটী অভিভাষণে বা বক্তৃতায় তাহা ব্যক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—তাই আমি সে চেষ্টাও করিব না। বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া আমি মূল সমস্যা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব।

পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক সভ্যতার অভ্যুত্থান, ক্রমোন্নতি ও পতন হইয়াছে। আমরাও একদিন স্বাধীন ছিলাম ধর্ম্মে কর্ম্মে, কাব্যে সাহিত্যে, শিল্পে বাণিজ্যে, যুদ্ধবিগ্রহে ভারতবাসীও একদিন পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিত। কালের চক্রবৎ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সে প্রাচীন গৌরব হারাইয়াছি। আজ আমরা শুধু পরাধীন তাহা নয়,—বিদেশী সভ্যতার সম্মোহন-

বাণের আঘাতে আমরা আমাদের প্রাণ ধর্ম্ম হারাইতে বসিয়াছি। তবে আনন্দের বিষয় এই যে অজ্ঞান-নিশা প্রায় কাটিয়া গিয়াছে; আমরা জাতীয় চৈতন্য ফিরিয়া পাইতেছি।

সকল জাতি বা সকল সভ্যতার যে পতনের পর পুনরভ্যুত্থান ঘটিয়া থাকে—এ কথা বলা যায় না। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমাদের দেশে কিন্তু পতনের পর পুনরভ্যুত্থান আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের এই জাতীয় আন্দোলন বাহ্যিক চাঞ্চল্যমাত্র নয়,—ইহা জাতীর আত্মার জাগরণেও অভিব্যক্তি। আমার কথা যে সত্য তার প্রমাণ এই যে আমাদের দেশে নব জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। সৃষ্টিই জীবনের লক্ষণ, কাব্যে সাহিত্যে, শিল্পে বাণিজ্যে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, কলা বিজ্ঞানে—নূতন সৃষ্টির যে পরিচয় ভারতবাসী দিতেছে—তাহা হইতে সপ্রমাণ হইতেছে যে ভারতের আত্মা জাগিয়াছে, ভারতীয় সভ্যতার নূতন অধ্যায় আমাদের চোখের সামনেই রচিত হইতেছে।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, কোনও সভ্যতার পতন হইলে সেই জাতির সৃষ্টি-শক্তি লোপ পায়, জাতির চিন্তাশক্তি ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করিতে থাকে ব্যক্তি ও জাতির জীবনে adventure ও enterprise এর স্পৃহা হ্রাস পায়, কতকগুলি বাঁধা বুলির রোমন্থনের দ্বারা জাতি আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হইলে চিন্তা-রাজ্যে বড় রকমের ওলটপালটের প্রয়োজন এবং জীব-রাজ্যে (biological

plane) রক্ত-সংমিশ্রণ আবশ্যক। আমি বৈজ্ঞানিক নহি, সুতরাং আমার পক্ষে জোর করিয়া কিছু বলা সম্ভব নয়। তবুও আমার মনে হয় যে নূতন সভ্যতা সৃষ্টির মূলে খানিকটা রক্ত-সংমিশ্রণের আবশ্যকতা আছে। তবে ভারতের বাহিরের জাতির সহিত ভারতবাসীর রক্ত-সংমিশ্রণের প্রয়োজনীয়তা নাই। এরূপ সংমিশ্রণ যদি বেশী হয় তবে তার ফল অহিতকর হওয়ার আশঙ্কাই বেশী। ইহার দৃষ্টান্ত ব্রহ্মদেশ। কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে—বিশেষতঃ হিন্দু সমাজের মধ্যে—যে সব জাতি আছে—তাহাদের মধ্যে খানিকটা রক্ত-সংমিশ্রণ হইলে ফল যে ভাল হইতে পারে তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আমাদের জাতীয় অধঃপাতের অনেক কারণ আছে তন্মধ্যে একটা প্রধান কারণ এই যে, আমাদের দেশে ব্যক্তির ও জাতির জীবনে প্রেরণা বা initiative হ্রাস পাইয়াছে। আমরা বাধ্য না হইলে এবং কশাঘাত না খাইলে সহজে কিছু করিতে চাই না। বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করিয়া ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া যে অনেক সময়ে অনেক কাজ করা দরকার এবং বাস্তবের দৈন্যকে অগ্রাহ্য করিয়া আদর্শের প্রেরণায় জীবনটাকে অনেক সময়ে যে হাসিতে হাসিতে বিলাইয়া দেওয়া প্রয়োজন—এ কথা আমরা কার্য্যতঃ স্বীকার করিতে চাই না। এই জন্য প্রেরণা বা initiative-এর অভাবের দরুণ, ব্যক্তি ও জাতির ইচ্ছাশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। ব্যক্তির ও জাতির জীবনে ইচ্ছাশক্তি পুনরায় জাগাইতে না পারিলে মহৎ কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে

না। শুধু আদর্শের প্রেরণায়ই ইচ্ছাশক্তি জাগরিত হয়। আমরা আদর্শ ভুলিয়াছি বলিয়াই আমাদের ইচ্ছাশক্তি আজ এত: ক্ষীণ। বর্ত্তমানের ভাব-দৈন্য বিদূরিত করিয়া নিজ নিজ জীবনে আদর্শের প্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে আমাদের প্রেরণাশক্তি জাগিবে না— এবং প্রেরণাশক্তি না জাগিলে চিন্তাশক্তি ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা পুনরুজ্জীবিত হইবে না।

সমাজের পুনর্গঠনের জন্য আজকাল পাশ্চাত্যদেশে নানা প্রকার মতের ও কর্ম্মপ্রণালীর প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় যথা— Socialism, State Socialism, Guild Socialism. Syndicalism, Philosophical Anarnism, Bolshevism, Fascsim, Parliamentary Democracy, Aristocracy Absolute Monarchy, Limited Monarchy, Dictatorship ইত্যাদি। এই সব মতবাদেব বিষয় আমি সাধারণভাবে ২।১টী কথা বলিতে চাই। প্রথমতঃ সকল মতের ভিতর অল্প বিস্তর সত্য আছে, কিন্তু এই ক্রমোন্নতিশীল জগতে কোনও মতকে চরম সত্য বা চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত কাজ নয়। দ্বিতীয়তঃ এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে কোনও দেশের কোনও প্রতিষ্ঠানকে সমূলে উৎপাটন করিয়া আনিয়া বলপূর্ব্বক অন্য দেশে রোপন করিলে সুফল না ফলিতেও পারে। প্রত্যেক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয় সেই দেশের ইতিহাসের ধারা, ভাব ও আদর্শ এবং নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের প্রয়োজন হইতে। সুতরাং আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, কোনও

প্রতিষ্ঠান গড়িতে হইলে ইতিহাসের ধারা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বর্ত্তমানের আবহাওয়া অগ্রাহ্য করা সম্ভব বা সমীচীন নয়।

আপনারা জানেন যে Marxianismএর তরঙ্গ এ দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে; এই তরঙ্গের আঘাতে কেহ কেহ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। Karl Marxএর মতবাদ পূর্ণরূপে গ্রহণ করিলে আমাদের দেশ যে সুখসমৃদ্ধিতে ভরিয়া উঠিবে এ কথা অনেকে বিশ্বাস করেন এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহারা রুসিয়ার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু আপনারা হয়তো জানেন যে রুসিয়াতে যে Bolshevism প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—তার সহিত Marxian Socialismএর মিল যতটা আছে—পার্থক্য তদপেক্ষা কম নয়। রুসিয়া Marxian মতবাদ গ্রহণ করিবার সময়ে প্রাচীন ইতিহাসের ধারা, জাতীয় আদর্শ বর্ত্তমানের আবহাওয়া এবং নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের প্রয়োজনের কথা ভুলিয়া যায় নাই। আজ যদি Karl Marx জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি রুসিয়ার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া কতটা সুখী হইতেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে—কারণ আমার মনে হয় যে Kral Marx বিশ্বাস করিতেন যে তাঁহার সামাজিক আদর্শ একই ভাবে, রূপান্তরিত না হইয়া, সকল দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এ সব কথার অবতারণা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, আমি অন্য দেশের আদর্শ বা প্রতিষ্ঠান অন্ধভাবে অনুকরণ করার বিরোধী।

আর একটী কথার উল্লেখ না করিলে আসল কথাই বলা হইবে

না। পরাধীন দেশে যদি কোনও "isuu"—সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহা nationalism। যতদিন আমরা স্বাধীন না হইতেছি ততদিন আমরা সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক (Social and Economic) পুনর্গঠনের অবসর ও সুযোগ পাই না, এ কথা ধ্রুব সত্য। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমাদের সমবেত চেষ্টায় স্বাধীনতালাভ করিতে হইবে। দেশ, ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তি নয়—এবং কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি শ্রমিক, কি ধনিক—কোনও সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে, সকলের সহযোগ ব্যতীত, স্বরাজলাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাহা হইলেও, সকল ব্যক্তির ও সকল সম্প্রদায়ের ন্যায্য দাবী আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে; কারণ সত্য ও ন্যায়ের উপর আমাদেয় জাতীয়তা যদি প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে সে জাতীয়তা একদিনও টিকিতে পারে না। এই জন্য আমি সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক বা কৃষক সম্প্রদায়কে স্বরাজ—আন্দোলনের পরিপন্থী তো মনে করিই না—বরং আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব, যে তাহাদের সহযোগ ব্যতীত স্বরাজ-লাভের আশা দুরাশা মাত্র—এবং তাহারা যে পর্য্যন্ত সঙ্ঘবদ্ধ না হইতেছে ততদিন তাহাদিগের পক্ষে স্বরাজ আন্দোলনে অথবা সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে যোগদান করা সম্ভবপর হইবে না।

এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে সকল দেশে, বিশেষতঃ আমাদের এই অভাগা দেশে, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ই দেশের মেরুদণ্ড-স্বরূপ। তাহারা যে শুধু মুক্তিপথের অগ্রদূত তাহা নয়—

গণ-আন্দোলনের অগ্রদূত। যতদিন পর্য্যন্ত জন-সাধারণের মধ্যে প্রকৃত জাগরণ না আসিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই গণ-আন্দোলনের অগ্রদূত হইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত যাবতীয় গঠন-মূলক কাজে এই শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই অগ্রণী হইয়া পথ-প্রদর্শকের কাজ করিতে হইবে। এই সকল কারণে আমি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অভাব অভিযোগের বিষয়ে দুই-একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

প্রথমতঃ তাহাদের ভাবের অভাবের কথা। আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আদর্শপ্রেম ও আদর্শনিষ্ঠার অভাব আছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই ভাব দৈন্যের কারণ কি? কারণ এই, যে যাঁহারা আমাদিগকে শিক্ষা দেন তাঁহারা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আদর্শের বীজ আমাদের হৃদয়ে বপন করেন না। আমাদের ভাব-দৈন্যের জন্য আমি আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদিগকে প্রধানতঃ দায়ী করি। আমি জিজ্ঞাসা করি—আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় কি মুক্তির বায়ু খেলিতে পায়? যাহারা ঐ আঙ্গিনায় জ্ঞানাহরণের জন্য বিচরণ করে তাহারা কি মুক্তির আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়? আপনারা সকলে জানেন যে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে পূত আন্দোলন ফরাসী দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জাগরণের বন্যা আনিয়াছিল সেই আন্দোলনের অধিনায়ক ছিলেন—ফরাসী দেশের অধ্যাপক সম্প্রদায়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারা যায় আমাদের জাতীয় দুর্দশা কতদূর পৌঁছিয়াছে।

কিন্তু আমাদের হতাশ হইলে চলিবে না। অধ্যাপক সম্প্রদায় যদি নিজেদের কর্ত্তব্য না করেন—তাঁহারা যদি নিজ নিজ জীবনের আদর্শ ও শিক্ষার প্রভাবে মানুষ সৃষ্টি করিতে অক্ষম হন—তাহা হইলে ছাত্রদিগকে নিজের চেষ্টায় ও সাধনার দ্বারা মানুষ হইতে হইবে।

ভাবের দৈন্যের পরই অন্নাভাবের কথা মনে পড়ে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার সমস্যা যে কিরূপ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা নানা কারণে আমার জানিবার সুযোগ হইয়াছে। এ কথা বোধ হয় অনেকে জানেন না যে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থা আমাদের কৃষক সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থার চেয়েও অনেক বিষয়ে খারাপ। চাকুরীর দ্বারা যে তাহাদের অভাব মিটিতে পারে এ আশা নাই, কারণ শিক্ষিত যুবকের সংখ্যার অপেক্ষা চাকুরীর সংখ্যা অনেক কম। সুতরাং ইহা অনিবার্য্য যে আগামী ৩০।৪০ বৎসরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেককেই অনাহারে মরিতে হইবে। কিন্তু আজ হইতে আমরা যদি চাকুরীর আশা পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিই, তাহা হইলে আমরা মরিয়াও আমাদের সন্তান-সন্ততিদের বাঁচিবার উপায় করিয়া যাইতে পারিব। কিন্তু এখনও যদি আমরা চাকুরীর আশায় ঘুরিতে থাকি তাহা হইলে আমরা তো মরিবই—সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততিদের মরণের আয়োজন করিয়া যাইব। আমাদের মাড়োয়ারী ভাইরা ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ নিঃসম্বল ও কপর্দ্দকহীন অবস্থায় ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন

আমাদিগকেও ঠিক সেইভাবে ও সেই অবস্থায় ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে এবং নিজেদের অধ্যবসায়, চরিত্রবল ও কষ্টসহিষ্ণুতার দ্বারা ব্যবসায়ক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করিতে হইবে। "নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

আমাদের বর্ত্তমান কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া আমি মাত্র কয়েকটি কথা বলিব। আমাদের এখন দুই দিকে কাজ করিতে হইবে। প্রথমতঃ ভাবের দৈন্য ঘুচাইবার জন্য নূতন ভাবের ধারা প্রবাহিত করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ দেশের মধ্যে যতগুলি যুবক সমিতি ও যুবকদের আন্দোলন আছে বা ভবিষ্যতে হইতে পারে সে সকলের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিতে হইবে।

যাঁহারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টির কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন তাঁহাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান যাহাতে হয় তার জন্য একটা League of Young Intellectuals গঠন করা আবশ্যক। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বণিক, বৈজ্ঞানিক এবং সকল ক্ষেত্রের কর্ম্মী এই Leauge এর সভ্য হইবেন। এক কথায় বলিতে গেলে, যাহারা "best brain of the entire nation" তাঁহাদের একত্র করিতে হইবে —তাঁহাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ করিয়া দিতে হইবে এবং তাঁহারা সকলে যাহাতে একই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টি কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া সমগ্র জাতিকে সবল, সুস্থ ও কৃতী করিয়া তোলেন তাহার আয়োজন করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, যুবকদের কর্ম্ম প্রচেষ্টা যাহাতে ভিন্নমুখী ও পরস্পর বিরোধী না হয় এবং যাহাতে সকল চেষ্টা সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একই আদর্শের দিকে পরিচালিত হয়, তার জন্য কেন্দ্রীয় সমিতির আবশ্যকতা। এই উদ্দেশ্য লইয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নিখিল বঙ্গীয় যুবক সমিতি গঠিত হইয়াছিল। নানা কারণে ঐ সমিতির কার্য্যকলাপ আশানুরূপ ফল প্রদান করে নাই। কিন্তু আমার মনে হয় যে আজ ঐ নিখিল বঙ্গীয় যুবক সমিতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার সময় আসিয়াছে। কোনও নূতন কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন না করিয়া আপনারা যদি ঐ পুরাতন নিখিল বঙ্গীয় যুবক সমিতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আবার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন তাহা হইলে শীঘ্রই সুফল ফলিবে, একথা আমি বিশ্বাস করি।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বিস্তৃত কর্ম্মতালিকা দিবার চেষ্টা আমি করিব না। কি আদর্শ লইয়া এবং কি প্রণালীতে কাজ করা আবশ্যক সে বিষয়ে কিছু বলিলেই আমার কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইবে। বাস্তবের দিক হইতে দেখিলে আমাদের অভাব প্রধানতঃ তিন প্রকার—(১) অন্নাদির অভাব (২) বস্ত্রাদির অভাব (৩) শিক্ষাদির অভাব। আমরা অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, শিক্ষা চাই। কিন্তু মূল সমস্যার দিকে দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে আমাদের জাতীয় দৈন্যের প্রধান কারণ—ইচ্ছাশক্তি ও প্রেরণার অভাব। সুতরাং যদি আমাদের National will বা ইচ্ছাশক্তি জাগরিত না হয় তাহা হইলে শুধু অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই জাতীয় সমস্যার সমাধান হইবে না। Benevolent

Despot এর মত সরকার বাহাদুর অথবা Local Body রা যদি জন-সাধারণের অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন তাহা হইলেও আমরা মানুষ হইতে পারিব না। সকলের সাহায্য গ্রহণ করিতে দোষ নাই কিন্তু প্রধানতঃ নিজেদের সমবেত চেষ্টায় আমাদিগকে অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি আমরা সমবায়, প্রণালীতে এই কাজ করিয়া যাইতে পারি তাহা হইলে আমাদের জাতীয় ইচ্ছা শক্তি ফিরিয়া আসিবে—এবং স্বরাজ-স্বাধীনতা অনায়াসে লভ্য হইয়া পড়িবে।

পল্লী সংস্কারের কথা চিন্তা করিলে এই কথাই মনে হয়। আমাদের সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত যাহাতে গ্রামবাসীরা প্রধানতঃ নিজেদের চেষ্টায় অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করেন। প্রথম অবস্থায় গ্রামের বাহির হইতে সাহায্য পাঠানো দরকার হইতে পারে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যদি পল্লীবাসীরা স্বাবলম্বী ও আত্ম-নির্ভরশীল হইতে না পারেন তাহা হইলে সে পল্লীসংস্কারের কোনও সার্থকতা হইবে না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে সাধারণ গ্রামবাসীর মধ্যে পরমুখাপেক্ষিতার ভাবই প্রবল সুতরাং স্বাবলম্বনের ভাব জাগাইতে হইলে বহুদিন ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইবে।

আজকাল বন্যা ও দুর্ভিক্ষ নিত্য ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সময়ে অনেক সমিতি সাধ্যমত এই সকল অভাব মোচনের চেষ্টা করেন এবং ধনিক সম্প্রদায়ও অনেক ভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। এ সকল সৎপ্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা উচিত

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের মূল কারণ কি, সে বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করা প্রয়োজন। গবেষণা আরম্ভ করিলে একদিনেই যে আমরা একটা মীমাংসায় উপনীত হইব সে আশা আমি রাখি না। কিন্তু তথাপি অবিলম্বে এ বিষয়ে গবেষণা সুরু করা দরকার। আমি সকল চিন্তাশীল যুবককে এবং আমাদের বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়কে এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করি।

আমাদের সমাজের মধ্যে যে সব অত্যাচার ও অনাচার ধর্ম্ম বা লোকাচারের নামে চলিতেছে সে বিষয়েও যুবকদের একটা কর্ত্তব্য আছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় অনেক সময় বলেন যে আমাদের যুবকেরা বিবাহের সময়ে হঠাৎ বাপ-মার বাধ্য হইয়া পড়ে। আমার নিজের মনে হয় যে শুধু বিবাহ কেন—আমরা অনেক সময়ে সুবিধা মত বাপ-মার বাধ্য হইয়া পড়ি। যুবকেরা যে বাপ-মা বা গুরুজনের নামে মধ্যে মধ্যে অন্যায় কাজ করিয়া থাকেন—এ কথা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের যুবকেরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সামাজিক অত্যাচার ও দেশের অনাচার নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হন, তাহা হইলে অনতিবিলম্বে আমাদের সমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

আমার ভাই ও ভগিনী সকল, আজিকার মত আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাই। মনে রাখিবেন যে আমাদিগকে সমবেত চেষ্টায় ভারতবর্ষে নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে হইবে। পাশ্চাত্য

সভ্যতা আমাদের সমাজে ওতঃপ্রোত ভাবে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে ধনে প্রাণে মারিতে চেষ্টা করিতেছে। আমাদের ব্যাবসায়-বানিজ্য, ধর্ম্ম-কর্ম্ম শিল্প-কলা মরিতে বসিয়াছে। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে আবার মৃত-সঞ্জীবনী সুধা ঢালিতে হইবে। এ শুধা কে আহরণ করিয়া আনিবে? জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না। আদর্শের নিকট যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে বলিদান দিয়াছে—শুধু সেই ব্যক্তিই অমৃতের সন্ধান পাইতে পারে। আমরা সকলেই অমৃতের পুত্র, কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র অহমিকার দ্বারা পরিবৃত বলিয়া অন্তর্নিহিত অমৃত সিন্ধুব সন্ধান পাই না। আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি আসুন—আপনারা আসুন—মায়ের মন্দিরে গিয়া আমরা সকলে দীক্ষিত হই! আসুন, আমরা সকলে এক বাক্যে এই প্রতিজ্ঞা করি, যে দেশসেবাই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে—দেশমাতৃকার চরণে আমরা আমাদের সর্ব্বস্ব বলি দিব এবং মরণের ভিতর দিয়া অমৃত লাভ করিব। তাহা যদি আমরা করিতে পারি তবে নিশ্চয়ই জানিবেন—

"ভারত আবার জগৎ সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে!"

[বিগত ১লা পৌষ ১৩৩৪, কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউট হল-গৃহে নিখিল বঙ্গীয় যুব-সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ]

পাঁচ

"চিন্তা ও কর্ম্মের নবধারার প্রবর্ত্তন করিতে গেলে যে বর্ত্তমান ভাবধারা ও স্বার্থ এবং শক্তিশালী দলের সহিত আমাদের বিরোধ বাধিবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহাতে ভীত হইলে আমাদের চলিবে না। বিরোধ ও বহুবাধার মধ্য দিয়াই যুব-আন্দোলনকে অগ্রসর হইতে হইবে। এমন অনেক সময় আসিবে, যখন আমরা চারিদিক হইতে বাধা পাইব এবং সমস্ত জগৎ হইতে যেন আমরা বিচ্ছিন্ন—এইরূপ মনে হইবে। সেই সঙ্কট সময়ে আমাদের সেই আইরিশ মহাপুরুষের বাণী মনে রাখিতে হইবে, যিনি আসন্ন বিপদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—জগৎকে যেমন একজন (খৃষ্ট) উদ্ধার করিয়াছিলেন আয়ার্লণ্ডকে তেমনি একজনই উদ্ধার করিতে পারেন।"।

*

* *

মধ্য প্রদেশের যুব-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য আমাকে আমন্ত্রিত করিয়া আমাকে যে-সম্মান করিয়াছেন, তাহার জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

জাতীয় জীবনের এক গণসন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়া আমরা অগ্রসর হইতেছি। এখন সকল যুবকেরই কর্ত্তব্য আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্ম-পন্থা স্থির করিবার জন্য মিলিতভাবে পরামর্শ করা। আমাদের জাতীয় জীবনের মূলগত সমস্যাগুলির সমাধান করিবার বা তজ্জন্য চেষ্টা করিবার উদ্দেশ্যে মধ্য-প্রদেশের যুবকেরা যে বয়োবৃদ্ধগণের সাহায্যের মুখ না চাহিয়া নিজেরা উৎসাহী হইয়া চেষ্টা করিতেছেন, ইহাকে আমি বর্ত্তমান সময়ের অত্যন্ত আশাপ্রদ লক্ষণ বলিয়া মনে

করি। যদি আপনাদের এই মহৎ প্রচেষ্টার সাফল্যের একটুও সাহায্য করিতে পারি, তবে আমি নিজেকে ধন্য এবং আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

যাঁহারা বর্ত্তমানের এই যুব-আন্দোলনের প্রতি খানিকটা বিরূপ, অথবা ইহার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা উপলব্ধি করিতে অক্ষম বলিয়া স্বীকার করেন, এদেশে এরূপ কেহ কেহ আছেন—এবং সাধারণের চক্ষে তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা প্রতিষ্ঠাবান্, যুব-আন্দোলনের গূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই, অথচ তাঁহারা যোগদান করেন নাই বলিয়া এরূপ কোনও আন্দোলন গড়িয়া উঠা উচিত নয়—সম্ভবতঃ এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যুব-আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন, এরূপ লোকের অভাব নাই!

ভারতবর্ষে আজিকার এই নবজাগরণের প্রথম উন্মেষের সময় হইতেই এক এক করিয়া অনেকগুলি আন্দোলন-প্রচেষ্টা ও ভাব-ধারার আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাদের অস্তিত্ব সত্ত্বেও যে যুব-আন্দোলনের রূপ লইয়া অপর একটা আন্দোলনের জন্ম হইবে, ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে ইহার আবির্ভাবের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। ব্যক্তি ও জাতির প্রাণে নিশ্চয়ই এমন কোনও গভীর আকাঙ্খা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যাহার ফলে যুব-আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। অন্তরের সেই মূলগত আকাঙ্খা হইতেছে স্বাধীনতা ও আপনাকে সার্থক করিবার আকাঙ্খা।

দেশ আজ এমন একটী আন্দোলন চায়, যাহা ব্যক্তি ও জাতিকে সর্ব্বপ্রকারের বন্ধন হইতেই মুক্তি দিবে—তাহার আত্ম-

প্রকাশ ও সার্থকতার সকল পথই খুলিয়া দিবে। কেহ কেহ হয়তো যুব-আন্দোলনকে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত একটী শাখা-আন্দোলনে পরিণত করিতে চাহেন; কিন্তু তাঁহারা ইহার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

কংগ্রেস মূলতঃ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান; ইহার উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ। রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কেও কংগ্রেস এখনও পূর্ণ স্বাধীনতাকে লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাই যে সকল তরুণ-তরুণী জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিতে চাহেন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে চাহেন, তাঁহারা যে কংগ্রেসের মত শুধুমাত্র রাজ-নৈতিক প্রতিষ্ঠান লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবেন না এবং মানব-হৃদয়ের সকল আকাঙ্খা ও জীবনের সকল কামনাকে পূর্ণ করিতে চাহে এমন একটি আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে চাহিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। তাই বুঝা যায়, যুব-আন্দোলন কেবল মাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন না হইলেও রাজনীতি ছাড়া নয়। ইহার উদ্দেশ্যের পরিধি জীবনের মতই ব্যাপক। ইহার সমগ্রতার মধ্যে জীবনের সকল ভিন্ন ভিন্ন দিকগুলিই রহিয়াছে বলিয়া যুব-আন্দোলন আমাদের রাজনৈতিক উন্নতিতেও উৎসাহদান করিবে।

যুব-আন্দোলন বর্ত্তমানের প্রতি আমাদের অসন্তোষের প্রতীক। যুগ-সঞ্চিত বন্ধন, স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইহা একটি বিশিষ্ট রূপ। সকল শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানবের অফুরন্ত সৃজনীশক্তি-প্রকাশের ক্ষেত্র উন্মুক্ত করিয়া দিয়া আমাদের

ও মানবজাতির জন্য নূতনতর জগতের প্রতিষ্ঠাই ইহার লক্ষ্য। যুব-আন্দোলন তাই বর্ত্তমান আন্দোলনসমূহের উপরে ন্যস্ত একটা অতিরিক্ত বা বিদেশ হইতে আমদানী করা কর্ম্মধারা নয়—ইহা সত্যকার একটা স্বতন্ত্র আন্দোলন এবং ইহার মূল উৎস মানব-স্বভাবের গভীরতম অন্তঃস্থল।

বর্ত্তমান যুগের একটী বিশিষ্ট অভাব ও মানুষের প্রাণের উদগ্র বাসনাকে পূর্ণ করিবার জন্যই ইহার আবির্ভাব। ইহার গূঢ় অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিলে কেবল মাত্র আন্দোলনে যোগদান করিলে বা যুবসংঘে প্রাধান্য স্থাপন করিলে কোন ফললাভ হইবে না। আমার মনে হয়, যুব-আন্দোলনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যটী না থাকিলে কেবলমাত্র তরুণ-তরুণীর সংঘ হইলেই কোন প্রতিষ্ঠান যুব-সংঘ পদবাচ্য হইতে পারে না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একটা চঞ্চলতা ও বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি অসন্তোষ এবং নব-সমাজ স্থাপনার প্রচেষ্টা এই আন্দোলনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। সকল প্রকার বন্ধন মুক্তি এবং যেখানে আচার ও অবস্থা মানুষের বিবেকের ইঙ্গিতের বিরুদ্ধে যাইতে চাহে, সেখানে আচার ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—যুব-আন্দোলনের ইহাই লক্ষ্য। তাহাদের মন্ত্র হইতেছে আত্মনির্ভরতা—অন্ধ ভক্তি ও বয়োবৃদ্ধদের অবিচল অনুবর্ত্তিতা হইতে তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহাতে যদি বয়োবৃদ্ধদের কেহ কেহ যুব-আন্দোলনকে সন্দেহ ও বিতৃষ্ণার চক্ষে দেখেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

আমাদের সমস্ত জীবনের ধারাকে নব নব পথে প্রবাহিত করা

এবং নবীন আদর্শের অনুপ্রেরণায় সঞ্জীবিত করাই যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য। আমরা জীবনের যে পুনর্গঠন করিতে চাই, এই আদর্শই তাহাকে নব অর্থ ও নব প্রেরণা দিবে। এই আদর্শ হইতেছে পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ও আপনাকে চারিদিক দিয়া সার্থক করিয়া তোলা। স্বাধীনতা ও জীবনের সার্থকতা নিবিড় ও অচ্ছেদ্যভাবে পরস্পর-সম্বন্ধ। স্বাধীনতা না থাকিলে নিজেকে সার্থক করা সম্ভব হয় না। এবং সার্থকতার দিকে জীবনকে লইয়া যায় বলিয়াই স্বাধীনতা এত মূল্যবান্।

যুব-আন্দোলনের পরিধি জীবনের মতই ব্যাপক। তাই জীবনে যতগুলি দিক্ আছে, যুব-আন্দোলনেও ততগুলি দিক্ থাকিবে। শরীরকে সঞ্জীবিত করিতে হইলে আমাদিগকে ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যায়াম করিতে হইবে; হৃদয়কে মুক্ত ও নবশিক্ষা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে নূতনতর সাহিত্য, উচ্চতর ও উৎকৃষ্টতর শিক্ষাপ্রণালী ও সুদৃঢ় নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সমাজকে নবজীবন দান করিতে হইলে আমাদিগকে নির্দ্দয়ভাবে বাঁধা আচারব্যবস্থা ও ভাবধারা দূর করিয়া নূতন ও বলীয়ান্ সমাজ-ব্যবস্থা ও ভাবসমূহের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। আরও যুগোচিত আদর্শের আলোকে আমাদিগকে বর্ত্তমান সামাজিক ও নৈতিক ব্যবস্থাকে যাচাই করিয়া লইতে হইবে—এবং সম্ভবতঃ, আমাদিগকে এরূপ নৈতিক ও সামাজিক আদর্শের অবতারণা করিতে হইবে, যাহা ভবিষ্যতের পথও নিয়ন্ত্রিত করিবে।

চিন্তা ও কর্ম্মের নবধারার প্রবর্ত্তন করিতে গেলে যে বর্ত্তমান

ভাবধারা ও স্বার্থ এবং শক্তিশালী দলের সহিত আমাদের বিরোধ বাধিবে, তাহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহাতে ভীত হইলে আমাদের চলিবে না। বিরোধ ও বহু বাধার মধ্য দিয়াই যুব-আন্দোলনকে অগ্রসর হইতে হইবে। এমন অনেক সময় আসিবে, যখন আমরা চারিদিক হইতে বাধা পাইব, এবং সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া আমাদিগকে মনে হইবে। সেই সঙ্কট সময়ে আমাদের সেই আইরিশ মহাপুরুষের কথা মনে রাখিতে হইবে, যিনি আসন্ন বিপদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—"জগৎকে যেমন একজন (খৃষ্ট) উদ্ধার করিয়াছিলেন, আয়ার্লণ্ডকে তেমনি এক জনই উদ্ধার করিতে পারে।" যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্যানুযায়ী যে মুহূর্ত্তেই আপনারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনতার আদর্শকে প্রতিফলিত করিবেন, সেই মুহূর্ত্তেই চারিদিকে শত্রুর আবির্ভাব হইবে এবং সকল স্বার্থবান্ ব্যক্তিই আপনাদিগকে বিধ্বস্ত করিবার উদ্দেশ্য একত্রিত হইবে। একদিক হইতে দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর সহিত সংগ্রাম করা সহজ—কিন্তু একযোগে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিলে শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। যুব-আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের তাই কঠিন শত্রুর সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে।

আরও একটী বিষয় আমাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, সেজন্যে আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। রাজনৈতিক বা শ্রমিক আন্দোলনে জনসাধারণের উপর কর্ত্তৃত্ব

বজায় রাখার জন্য তাহাদের ভাব ও চিন্তার সহিত সহানুভূতি জানানো অনেক সময়ে প্রয়োজন, কিন্তু যুব-আন্দোলনে যোগ দিতে হইলে আপনাদিগকে জনপ্রিয় হইবার লোভ একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। কখনও কখনও জনমত গঠন করার বা জনসাধারণের মনের উচ্ছ্বাস দমন করার দায়ীত্বও আপনাদিগকে লইতে হইবে। যদি আপনারা জাতীয় জীবনের মূলগত সমস্যাগুলির সমাধান করিতে চাহেন, তবে আপনাদের সমসাময়িক ব্যক্তিগণের চেয়ে দৃষ্টিকে বহুদূর সম্মুখে প্রসারিত করিয়া রাখিতে হইবে। জনসাধারণের চিন্তা বর্ত্তমানের বন্ধন কাটিয়া ভবিষ্যতের রূপটীকে উপলব্ধি করিতে পারে না। দেশের ভবিষ্যতে অমঙ্গলের পথ রুদ্ধ করিয়া যদি তাহার প্রতিবিধান করিতে আপনারা চাহেন, তবে জনসাধারণ যে আপনাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে চাহিবে না, তাহা অসম্ভব নহে। তখন বন্ধুবিহীন অবস্থায় একাকী দাঁড়াইয়া সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারার মত সাহস আপনাদের মনে জাগরূক হওয়া চাই। জনপ্রিয়তার স্রোতে যে চিরদিন ভাসিয়া থাকিতে চায়, সে হয়ত সাময়িক ভাবে সাধারণের প্রশংসা লাভে সমর্থ হয়—কিন্তু ইতিহাসে সে অমর হইতে পারে না, ভবিষ্যতের ইতিহাস সে সৃষ্টি করিতে পারে না। জাতির ইতিহাস গঠিত করিতে হইলে আমাদিগকে বহু বিরুদ্ধবাদ ও অত্যাচার সহিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। অত্যন্ত নিঃস্বার্থ কাজের জন্য নিন্দা ও বিদ্রূপ, নিকটতম বন্ধুর নিকট হইতে ঈর্ষা ও শত্রুতা—ইহাতে আশ্চর্য্য হইলে চলিবে না।

কিন্তু মানব স্বভাবে একটা অন্তর্নিহিত দেবত্ব আছে, তাই ভুল উপলব্ধি, নিন্দা ও অত্যাচারের দীর্ঘ দিনও একদিন শেষ হয়। গভীরতম বিশ্বাসের জন্য মরিতে হইলেও সে মৃত্যু আমাদিগকে অমর করিয়া রাখিবে। তাই যে কোন অবস্থার জন্যই আমাদিগকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। আঘাত বিপদ আছে বলিয়াই ত' জীবনের মূল্য আছে—ত্যাগ, শোক ও অত্যাচার না থাকিলে জীবনের কি কোন সৌন্দর্য্য, কোন বিচিত্রতা থাকিত ?

মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে—রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক, শরীরগত এবং শিক্ষা-দীক্ষাগত—যুব-আন্দোলনের এই পাঁচটী দিক্ আছে। এই আন্দোলনের লক্ষ্য দ্বিধাবিভক্ত—উপরোক্ত পাঁচটী বিভাগে বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করা এবং এই মুক্তি লাভ করিয়া আপনাকে সার্থক করিবার ও প্রকাশ করিবার পথে নিজেকে উদ্দীপিত করা। সুতরাং, ইহা একাধারে ধ্বংস ও গঠন মূলক। একদিক হইতে ভাঙ্গিয়া না ফেলিলে আর একদিক হইতে গঠন করা যায় না। সেই জন্যই দেখিতে পাই, প্রকৃতির মধ্যে ভাঙ্গা-গড়া পাশাপাশি চলিতেছে। ধ্বংস ভাল নয়, গঠনই ভালো এবং ধ্বংস না করিয়া গঠন করা সম্ভব—একথা মনে করিলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। আবার, ধ্বংসেই ধ্বংসের লক্ষ্য, একথা মনে করাও ভুল হইবে। জীবনের কোন একটী ক্ষেত্রে স্বাধীনতার প্রচেষ্টা বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি লাভ করিলেই অনেক জিনিষ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়, অনেক সময়ে হয়ত নির্দ্দয় ভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। অসত্য, অপটতা, বন্ধন ও সাম্যের অভাবকে কোন মতেই

মানিয়া চলা যায় না। এই সমস্ত বন্ধন শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। যখন আমাদের কর্ত্তব্য শুধু সম্মুখে অগ্রসর হওয়া, তখন পশ্চাতের মুখ চাহিয়া পিছনে পড়িলে চলিবে না।

ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাহিরের বহু আধুনিক আন্দোলনই সংস্কার-মূলক। এই সকল আন্দোলন জীবনের প্রান্তভাগ স্পর্শ করিয়া যায়—জীবনের রূপটীকে পরিবর্ত্তিত করে না। আমরা সংস্কার চাই না—মূলগত রূপান্তরই চাই। ব্যক্তিগত ও সামাজিক —উভয় জীবনকেই পুনর্গঠিত করিতে হইবে। এই নবজীবন লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে উদ্দীপিত করিবার জন্য স্বাধীনতার একটা নূতনতর ধারণা জন্মানো প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন কালে স্বাধীনতার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও স্বাধীনতার ধারণাটী ধীরে ধীরে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। আজ স্বাধীনতার অর্থই হইতেছে—সকল প্রকার বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি। অন্ততঃ এই অর্থটীই যুবকদের মনে ভালো লাগিয়াছে। অর্দ্ধপথে গিয়া থামিয়া থাকা আর আমাদের ভালো লাগে না—আমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। আমরা যদি স্বাধীনতার জন্যই স্বাধীনতাকে ভালবাসি, তবে বন্ধন বা বৈষম্যকে আমরা কোন মতেই সহ্য করিতে পারিব না। রাজনৈতিকই হউক, অর্থনৈতিক হউক বা সামাজিকই হউক—সকলের উপরেই পূর্ণ স্বাধীনতার মূল নীতিটাকে প্রয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। নব-

নারী নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মানবেরই একটা জন্মগত সাম্য আছে এবং তাহাকে বিকশিত করিবার সকল সুযোগই আমাদের দিতে হইবে—ইহাই হইবে আমাদের কথা। এই নীতিটিকে মুখে বলা সহজ কিন্তু ইহাকে অনুসরণ করা দুরূহ।

বন্ধুগণ, যাঁহারা যুব-আন্দোলনের বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি সাধন করিতে চাহেন, তাঁহাদের কার্য্য প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ দিতে গিয়া আমি অকারণ আপনাদের সময় নষ্ট করিব না। এই আন্দোলনের আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোচনা করিলেই আমার কার্য্য শেষ হইল। আমাদের আদর্শ অত্যন্ত সুদূরস্পর্শী—হয়ত ইহার চেয়ে দুরূহ আদর্শ মানুষ কল্পনাও করিতে পারে না। আমরা আমাদের সমস্ত জীবনকে রূপান্তরিত করিতে চাই—নিজেদের ও সমস্ত মানব জাতির জন্য নূতন উজ্জ্বলতর জগৎ সৃষ্টি করিতে চাই। একমাত্র স্বাধীনতার মোহন স্পর্শই আমাদের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া অবিরত কর্ম্মস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিতে পারে। কেমন করিয়া আমাদের এবং দেশবাসীর মনে এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিতে পারি, সেই হইতেছে আমাদের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। আমরা যদি হৃদয়ের গভীর অন্তঃস্থল হইতে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করিতে চাই, তাহা-হইলে আমাদিগকে দাসত্বের বেদনা ও বন্ধনের দুঃখটীকে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে হইবে। এই অনুভূতি যখন তীব্র হইবে, তখন আমরা একথা উপলব্ধি করিতে পারিব যে স্বাধীনতাহীন হইয়া বাঁচিয়া থাকার কোন মূল্য নাই এবং এই অভিজ্ঞতা বাড়িয়া

চলার সঙ্গে সঙ্গে এমন দিন আসিবে, যেদিন আমাদের সকল প্রাণ স্বাধীনতা-তৃষ্ণায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে।

মনের এই অবস্থায়ই আমরা স্বাধীনতার একনিষ্ঠ প্রচারক হইতে পারি। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় মত্ত নরনারী আমরা, তখন গ্রামে গ্রামে, দ্বারে দ্বারে গিয়া স্বাধীনতার এই নূতন বাণী প্রচার করিতে পারিব। এই প্রচার কার্য্যের ফলে তখন জীবনের সকল পথেই নবজীবনের স্পন্দন আসিবে। একদিক দিয়া ভাঙ্গা, অপর দিক দিয়া গঠন আরম্ভ হইবে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ সকলেরই ক্ষেত্র তখন এক নূতন প্রেরণায় উদ্বেল হইয়া উঠিবে—সে প্রেরণা স্বাধীনতা ও সাম্যের। পথ নিরোধকারী আচার, যুগসঞ্চিত বাধা, জীবনের সকল মিথ্যা মাপকাঠি সেদিন চূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া নবসৃষ্টির পথ সুগম করিয়া দিবে। আমরা যদি মুক্তি, সাম্য ও মৈত্রীর উপরে প্রতিষ্ঠিত নব-সমাজের সৃষ্টি করিতে পারি তবে শুধুমাত্র যে জাতীয় সমস্যার সমাধান করা হইবে তাহা নয়—জগতের এক বিপুল সমস্যার সমাধানও করা হইবে।

ভারতবর্ষ একটী ছোট-খাটো পৃথিবী—জগতের সকল সমস্যাই ভারতবর্ষে বর্ত্তমান আছে। তাই ভারতের সমস্যা সমাধানের অর্থই জগতের সমস্যার নিরাকরণ। অবর্ণনীয় দুঃখ বেদনা ও অগণিত বিরোধ-সংঘর্ষের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ আজিও বাঁচিয়া আছে। তাহার কারণ, তাহার একটী বিশিষ্ট সাধনা আছে। জগৎকে রক্ষা করিতে হইবে বলিয়াই ভারতবর্ষের আজ নিজেকে বাঁচাইতে হইবে। স্বাধীন ভারতবর্ষ জগতের শিক্ষা দীক্ষা ও

সভ্যতাকে তাহার আপন অতুলনীয় অবদানটী দিবে, তাই তাহার মুক্তি লাভের প্রয়োজন আছে। জগৎ আজ ভারতের দানের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া চাহিয়া আছে—তাহা না পাইলে জগৎ দীনতর থাকিবে।

বন্ধুগণ, আমাদের দায়িত্ব অতি কঠিন। প্রতি যুগে, প্রতি দেশে যৌবনই মুক্তির আলোক-বর্ত্তিকাটীকে উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছে। বিদেশী যুবাদের দৃষ্টান্তে আজ আমাদেরও জীবন যাপন করিতে হইবে। আমরা যদি আজ উঠিয়া দাঁড়াই তবে তাহারা যে কাজ করিতে সক্ষম হইয়াছে, আমরাও তাহা পারিব। আমরা এক পরিবর্ত্তনসঙ্কুল যুগের মধ্যে বাঁচিয়া আছি—আজ ভারতবর্ষের ভাগ্যলিপি ভারতের যৌবনের হস্তে ন্যস্ত। আমাদের দেশের যুবক-যুবতীরা তাঁহাদের এই মহান্ দায়িত্ব-ভার উপলব্ধি করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। আমি জানি, তাঁহাদের আত্মত্যাগ, তাঁহাদের দুঃখ স্বীকার এবং তাঁহাদের কর্ম্মের মধ্য দিয়া স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্ম হইবে—যে ভারতে মুক্ত নরনারী জন্মগ্রহণ করিবে এবং শিক্ষা ও উন্নতির সমান সুযোগ লাভ করিবে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবে তাহা নিঃসন্দেহ। একমাত্র কথা এই, কবে ভারত স্বাধীন হইবে? আমরা পরাধীন হইয়া জন্মিয়াছি একথা সত্য, কিন্তু স্বাধীন দেশে মরিব, দেশকে মুক্ত করিয়া মরিব, আসুন আমরা এই প্রতিজ্ঞা করি। আর যদি বা জীবনে মুক্ত ভারতবর্ষের রূপ দেখিতে না পারি, তবে যেন ভারতবর্ষকে মুক্ত করিতে জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারি।·········

স্বাধীনতার পথ কণ্টকময় পথ—কিন্তু ইহা অমরত্বের পথও বটে। মধ্য প্রদেশের ভাই ভগিনীগণ, এই পথে আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি। বন্দেমাতরম্।

[গত ২৯শে নবেম্বর ১৯২৯ তারিখে মধ্যপ্রদেশ যুব-সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ। ইংরাজী হইতে অনূদিত।]